হাতের কাজ

হাতের কাজ

হিরণ্ময় ঘোষাল

দি ন্যাশন্যাল লিটারেচার কোম্পানী
১০৫, কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ, ভাদ্র, ১৩৪৮।

দি ন্যাশন্যাল লিটারেচার কোম্পানীর পক্ষ হইতে শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
কর্তৃক প্রকাশিত ; এবং ট্রুথ প্রেস ৩, নন্দন রোড হইতে
শ্রীসুধাংশুরঞ্জন সেন কর্তৃক মুদ্রিত।

Halko,

gdzie twój kraj

tam i mój.

পরিচয়-লিপি

এই সমষ্টির প্রথম তিনটি কাহিনী "পরিচয়"-পত্রিকায় বেনামীতে প্রকাশিত হয়েছিল। শেষের তিনটি আজ পর্যন্ত একেবারে অস্পৃশ্যস্পর্শ্যা। এই ছ'টি আখ্যায়িকা নিয়ে "হাতের কাজ"। "হাতের কাজ" এই জন্যে যে, কাহিনীক'টির মনন ও বিষয়বস্তু অপেক্ষা তার গঠন ও পরিণতির দিকে অধিক দৃষ্টি রাখা হয়েছে। শুনতে পাই, নাকি মানুষের ভাষণ-শক্তির বিকাশের আগে তার মানবতার পরিচয় ছিল তার দু'খানা হাত, যার বলে ও কৌশলে সে অভিব্যক্তির নিয়মের অনুসারে মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হয়েছে। এ দিক দিয়েও "হাতের কাজ" নামের সার্থকতা, কারণ কাহিনীগুলি কথা-সাহিত্যে লেখকের প্রথম প্রয়াস। কলের কাজের নির্ভুলতা এদের নিশ্চয়ই নেই এই অতি সহজ কারণে যে, তাহ'লে তারা হাতের কাজ হ'তে পারতো না। প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনাটি * পোলদেশের চাষার হাতে বোনা মোটা অতসীর কাপড়ের ওপর রঙিন সুতোর বৈচিত্র্য। অশিক্ষিত কিষাণের সৌন্দর্য-সৃষ্টির নিদর্শনটুকুকে এই কাহিনী-সমষ্টির ঠিক প্রতীক নয়, কতকটা আদর্শরূপে ব্যবহার করেছি। শেষ কথা এই যে, আখ্যায়িকাগুলি অনুবাদও নয় বা কোনো পোলীয় গল্পের ছায়াও নয়। এগুলি বাংলাভাষায় পোলীয় দৈনন্দিন জীবন অবলম্বন করে' মৌলিক গল্প, ওদেশে লেখকের দীর্ঘকাল প্রবাসে ওদেশের মানুষ ও গাছপালার সঙ্গে যে নিবিড় আত্মীয়তা গড়ে' উঠেছিল, তারই নিতান্ত স্বাভাবিক প্রকাশ।

কলিকাতা,
ভাদ্র, ১৩৪৮।

হিরণ্ময় ঘোষাল

* শ্রীমতী Maria Stefkowa প্রকাশিত গ্রাম্য সূচী-শিল্প-সংগ্রহ থেকে পুনর্মুদ্রিত।

ৎস্যীগান্

'বুগ্' নদীর ধারে যেমন তেমন করিয়া ছাড়ানো কয়েকখানা চাষার ঘর লইয়া যে ক্ষুদ্র গ্রামখানি তাহার সরকারী নাম কাহারো জানা নাই। নদী হইতে গ্রামে উঠিবার পথে একখানা লৌহফলকে ঐ গ্রামের বিবরণ সহজেই পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে: পুরুষসংখ্যা ২৮, স্ত্রীসংখ্যা ৩৩, শিশুসংখ্যা ১৯। এই নগণ্য মানবগোষ্ঠীর একমাত্র অধিনায়ক বৃদ্ধ স্লিনারচ্যিক্ কিছুদিন হইল আমেরিকায় দ্বাদশ বর্ষ প্রবাসের পর আপন বাপ্-দাদার কবরের পাশে স্থান লইবার জন্য তাহার বহুকষ্টে অর্জিত ডলারের পুঁজি লইয়া দেশে ফিরিয়াছে। তাই এ গ্রামের নির্লজ্জ দারিদ্র্যের মাঝে স্লিনারচ্যিকের ইট, কাঠ ও টালির বাড়ীখানাকে উলঙ্গ ব্যক্তির বাহারে টুপির মত দেখায়। স্লিনারচ্যিকের আস্তাবলে ঘোড়া, গোহালে গরু, শূয়ারখানায় শূকর, গুদামভরা গম, রাইশস্য, মটর, কাশা,*

*বার্লি-জাতীয় একপ্রকার শস্য, দেখিতে কতকটা মুগের ডালের মত। প্রায় সমস্ত স্লাভ-দেশে পরিচিত।

আলু, ও সারা আঙ্গিনা ভরিয়া পর্বতপ্রমাণ বিচালীর গাদার আশেপাশে নানা রংবেরঙের অসংখ্য হাঁস, মুরগী ও পেরু খুঁটিয়া খুঁটিয়া খাইয়া ফেরে।

একদা শীতের রাত্রে পৃথিবী যখন বৈধব্যের শ্বেতবসনে আবৃত হইয়া উপুড় হইয়া পড়িয়া পড়িয়া কাঁদিতেছে, তখন ধরার এক অভুক্ত সন্তান বাইবেল ও খ্রীষ্টের আদেশ উল্লঙ্ঘন করিয়া ধনী প্রতিবেশী স্লিনার-চ্যিকের শস্যপরিপূর্ণ কোষাগারে প্রবিষ্ট হইল। পরদিন দ্বিপ্রহরবেলায় কোন্ এক দূর গ্রাম হইতে আনীত হিংস্র-স্বভাব ৎস্নীগান্ স্লিনারচ্যিকের আজীবন-অর্জিত ঐশ্বর্যের প্রহরীরূপে নিযুক্ত হইল।

গুদামঘরের একপাশে মেঝের মাটি ধসিয়া একটা গুহার মত গর্ত হইয়াছিল, তাহাতে করোগেডের টিনের দেওয়াল আর মাটির মাঝখানে যে ফাঁক দিয়া স্লিনারচ্যিকের শস্যসম্পদের কয়েকটিমাত্র কণা অপহৃত হইয়াছিল, সেইখানেই এই নবানীত যক্ষের আস্তানা নিরূপিত হইল। খড় ও চট বিছানো গর্তের মধ্যে ঘোলা অন্ধকারে ৎস্নীগানের নেশাখোরের মত রাঙা চোখদুইটা হিংস্র নির্বুদ্ধিতায় জ্বলজ্বল করিত।

বহু রক্তের সংমিশ্রণে ৎস্নীগানের জন্ম, তাই তাহার আকৃতিতে কোনো বিশেষ জাতির প্রকট চিহ্ন দেখা যাইত না। কান দুইটা ঝোলা ঝোলা, থ্যাবড়া মুখটা কতকটা বুলডগের মত, এবং মাথাটা ইডিয়টের মত চ্যাপ্টা। রং কালো ও স্থানে স্থানে নানা মেশানো রঙের ছিট্। তাহার মুখের ভিতরটা কুচকুচে কালো ও দাঁতগুলা ড্রাগনের দাঁতের মত। দাঁত ছাপাইয়া তাহার খর জিভটা অজগরের জিভের মত আলস্য-জড়িত লালসায় সর্বদাই লক্-লক্ করিত। তাহার শরীরের সমস্ত অংশের মধ্যে তাহার বলিষ্ঠ জঙ্ঘা দুইটা এক উনস্বাভাবিক ঐন্দ্রিকতার পরিচয় দিত, এবং তাহার এই অস্বাভাবিক ইন্দ্রিয়-ক্ষুধাকে অভুক্ত রাখিয়া তাহার হিংস্রতাকে শানাইয়া তুলিবার জন্য তাহাকে অষ্টপ্রহর বাঁধিয়া রাখা হইত।

রংটা কালো বলিয়া তাহার নাম ছিল ৻স্ত্রীগান্ *, কিন্তু ৻স্ত্রীগান্ বলিয়া হাজার বার ডাকিলেও সে ভ্রূক্ষেপমাত্র করিত না, যেন মানুষের দেওয়া কোনো নামকেই সে গ্রাহ্য করে না। আপন মস্তিষ্কের এক গহন কোণে তাহার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে একটা ধোঁয়াটে রকমের ধারণাকে স্মরণ রাখিয়া সে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিত, আর কখনো কখনো গভীর রাত্রে দূর পথে চলা কাহারো পায়ের খস্-খস্ শব্দ শুনিয়া জংলী জানোয়ারের মত এক অদ্ভুত ভাঙ্গা কাঁপা গলায় চীৎকার করিয়া পাড়া মাথায় করিত। তাহার সেই স্বর উন্মাদের অর্থহীন চীৎকারের মত রাত্রি ভেদ করিয়া দিকে দিকে প্রতিধ্বনিত হইত। তাহাতে তাহার অন্ধ রোষ যেন শতমাত্রায় বৃদ্ধি পাইত এবং সে আপনা-আপনি গজরাইয়া গজরাইয়া অস্থির হইত।

শীত কাটিয়া বসন্ত আসিল, এবং ম্লিনারচিকের সারা আঙ্গিনায় যেন উৎসবের ধূম পড়িয়া গেল। শূকরের ছানা ও হাঁস ও মুরগীর বাচ্চাগুলা দুরন্ত শিশুর মত আনাচে-কানাচে হৈ-হৈ করিয়া বেড়াইতে লাগিল, এমন কি পোষা খরগোশের বাচ্চাকয়টা পর্য্যন্ত দু'একবার চৌকাঠের বাহির হইয়া উঁকিঝুঁকি দিল। দেওয়ালের ফাঁক দিয়া জীবজগতের এই অকারণ আনন্দের পানে চাহিয়া ৻স্ত্রীগানের মনটা যেন কিসের এক অব্যক্ত বেদনায় টন্‌টন্ করিয়া উঠিল। রৌদ্রের দিকে পিট দিয়া এবং সাম্‌নের পা দুইটার উপর মাথা রাখিয়া সে দিন-দুপুরে স্বপ্ন দেখিতে বসিল।

'দূরে ঐ যে মানুষের মত কী একটি চলা ফেরা করিতেছে, ও বুড়ী ম্লিনারচিকভা, নয়? হাঁ, সেইরকম গন্ধ পাইতেছি বটে, মানুষের গন্ধের

* ইউরোপের অধিকাংশ দেশে বেদেরা ৻স্ত্রীগান্ নামে পরিচিত।

সঙ্গে গরুর গন্ধ মেশানো একটা অদ্ভুত জীব! জীবটা করিতেছে কী? বুঝিয়াছি, এইবার খাবার দিবার সময়। হাতে ঐ পাত্রটাতে কী? ইস্ সেই পুরানো দৈনন্দিন খোরাক! আলুসিদ্ধ চট্‌কানো, তাহাতে একটু পচা দুধ মেশানো আর খানিকটা নূন! যেদিন হইতে এ বাড়ীতে পা দিয়াছি সেই দিন হইতে এ খোরাকের একটুও বদল হয় নাই। গরু-ঘোড়াগুলা চক্ষু মুদিয়া শুক্‌নো ঘাসের রস উপভোগ করে দেখিয়াছি, তবে ওগুলা জন্তুমাত্র, উহাদের আবার খাওয়া! তাছাড়া সারাদিন তাহারা মাঠে মাঠে চরিয়া বেড়ায় এবং গাছপালা আগাছা যাহা পায় তাহাই গোগ্রাসে গিলিয়া ফেলে। উঠানের শোর-মুরগীগুলা পর্যন্ত একটু বৈচিত্র্য পায়। ঐ দেখ না, ঐ কালো মোরগটা একটা মস্ত কেঁচো কোঁৎ-কোঁৎ করিয়া গিলিয়া ফেলিল। থুঃ, কী কদাকার রুচি! "চিপ্-চিপ্-চিপ্—চীপ্!" প্লিনারচ্যিকভা মুরগী ও পেরুগুলাকে ডাকিতেছে। তাহারা উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিল। নির্বোধ জানোয়ারগুলা কীসের লোভে ছুটিতেছে! সেই ত অপরূপ আলু চট্‌কানো!—"মালুংকী—মালু-মালু-মালু—উ!" এবার শোরের বাচ্চাগুলার পালা। আরে বাস্! সব কয়টা একসঙ্গে কোথা হইতে হুটাপুটি করিয়া ছুটিয়া আসিল। একটা আমার কান ঘেঁসিয়া ছুটিয়া গেল, একটু সজাগ থাকিলে ধরিতে পারিতাম। আ-হা-হা, বড় ফসকাইয়া গেল! অমন ছোট্ট গোলগাল চেহারাটি, বোধ করি একটুও হাড় নাই, আর যদিও বা থাকে ত একেবারে কচি নরম তুলতুলে। আমার দাঁত শানাইবার মত একদম নয়, তবে নিশ্চয়ই ভারী মুখরোচক। কয়দিন হইল না, দুইটাকে মারিয়া বুড়া-বুড়ী কতকগুলা অপরিচিত মানুষের রসনা পরিতৃপ্ত করিল! কৈ হাড় একটাও ত কোনোখানে দেখিলাম না, এত শোঁকা-শুঁকি করিলাম! বহুদিন আগে পূর্বের প্রভুর বাড়ীতে একটু ছাড়া পাইয়া যে খরগোশের বাচ্চাটাকে ধরিয়া এক গ্রাসে

গিলিয়া ফেলিয়াছিলাম, শোরের ছানাগুলা নিশ্চয়ই খাইতে সেরূপ হইবে। ঐ যে বুড়ী আসিতেছে এইদিকে। ইস্ কী বোট্‌কা গন্ধ! আমায় ডাকিতেছে বোধ করি—ৎস্ত্রীগান্, ৎস্ত্রীগান্! আমি কিন্তু একটুও নড়িব না। রাখিয়া যাক্ না খাবার ঐ বাটিটাতে, যতক্ষণ ক্ষুধা সহ্য করিয়া থাকিতে পারি ততক্ষণ উহা আমি মুখে তুলিব না, এই শপথ করিতেছি। ৎস্ত্রীগান্, ৎস্ত্রীগান্! কেন রে বাপু অমন আদরের ডাক! ঐ অপরূপ খাদ্য সামগ্রীটি যথাস্থানে রাখিয়া প্রস্থান করো না মা! কোন্‌দিন হয়তো মেজাজ হারাইব, একটা খুনোখুনী কাণ্ড হইবে। ঐ ত খাবার, তাহাও যদি একটু শ্রদ্ধা করিয়া দিত, সব জানোয়ারগুলাকে খাওয়াইয়া তবে আমাকে! ইহারা সজ্জাতের সম্মান করিতে জানে না। সুধু তাই নয়, আমি না থাকিলে ঐ জন্তুগুলা থাকিত কোথায়! এই ত সেদিন রাত্রে অন্ধকারে একটা অজানা মানুষের গন্ধ পাইলাম ঠিক মুরগীগুলার ঘরের কাছে। একটু ডাকাহাঁকি করাতে লোকটা উধাও হইল, গন্ধটা এখনও যেন আমার নাকের ডগায় পাইতেছি। জগতে কৃতজ্ঞতা কি আছে? যাক্, বুড়ী খাবার রাখিয়া চলিয়া গেল, বাঁচিলাম যেন! মাঝে মাঝে মেজাজটাকে সামলাইতে ভারী কষ্ট হয়, তাহার উপর রাগ চাপিয়া অতি ভদ্রভাবে আমার ঐ অবশিষ্ট লেজের একটুখানি নাড়িতে যেন আমার মাথাটা একেবারে কাটা যায়। হ্যাঁ, কী যেন ভাবিতে ছিলাম না! তাই ত, হুঁ, জন্তুগুলা খাবার শেষ করিয়া আবার এই দিকে আসিতেছে। সারা আঙ্গিনায় তিল ধরিবার ঠাঁই নাই, শোরের ছানা, মোরগ, মুরগী, পেরু; হাঁস—কতগুলা হইবে? ঐ একটা, ঐ একটা, ঐ একটা, ইস্ অনেকগুলা! সেই হল্‌দে রঙের মোরগটাকে দেখিতেছি না কেন? সেই যেটা ভোর হইতেই বেড়ার উপর বসিয়া সারা উঠানটাকে যেন তাহার চাঁচা গলার ডাকে চিরিয়া ফেলিত। মাথায় ছিল তাহার প্রকাণ্ড ঝুঁটি,

কী একটা অন্য পাখীর মত। আর ঠ্যাং দু'খানা, মনে পড়িলে আমার ভিতরটা যেন পাক্ দিয়া উঠে। একদিন সেটা আমার বাটি হইতে খানিকটা খাবার চুরী করিতে আসিয়াছিল। আমি রোদে পড়িয়া ঘুমাইতেছিলাম, জাগিয়া দেখি প্রায় সমস্ত খাবার সে খাইয়া শেষ করিয়াছে। চোখ দুইটা আধোভাবে খুলিয়া তাহার ঘাড়টার দিকে তাগ করিতেছি, এমন সময়ে সে কী ভাবিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলাইয়া গেল, লজ্জায় নয়, ভয়ে। আশ্চর্য্য, কে যেন আমার মৎলবটা তাহাকে ইশারায় জানাইয়া দিল। কে, কে জানে, অথচ আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, অতটা বুদ্ধি তাহার ঐ তিল-পরিমাণ মগজে কোনোমতেই জোগাইত না। যাহা হউক তাহাকে আজ দেখিতেছি না কেন? হুঁ, বুঝিয়াছি, কাল সেটা কর্তার পাতে পড়িয়াছে, কারণ কাল সকালে কর্তাগিন্নীতে পরস্পর পরস্পরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া হাত ও মাথা নাড়িয়া খুব খানিকটা চেঁচামেচি করিল। এ রকম প্রায়ই হয়, যেন দুইটা মোরগে ঝগড়া করিতেছে। কর্তা যত চেঁচায়, গিন্নী তাহার শতাধিক। এবং সেইদিনই বিকালের দিকে একটা না একটা মোরগ বা মুরগীকে দেখা যায় না, সুধু উঠানের পাশে দু'একটা রক্তমাখা পালক পড়িয়া থাকে, আর হাড়গুলা যায় কোথায় কে জানে! আচ্ছা, দু'একখানা হাড়ও কি আমায় দিতে নাই যে দু'দণ্ড কিছু চিবাইতে পাই! ইস, হাড়ের নামেও যেন আমার দু'পাটি দাঁতের প্রত্যেকটি আড়ামোড়া ভাঙ্গিয়া উঠিয়া বসে! শেষবার যে হাড়টাকে পাই সেটাকে পাথর বলিলেই হয়। আমিই সেটাকে কানাচের মাটি খুঁড়িয়া বাহির করি, সেটা কিসের হাড় মনে নাই, মুরগীর কখনই নয়, কিন্তু তাহাতে মুরগীর পায়ের মতন অনেকগুলা আঙুল ছিল। সেটাকে দু'একবারমাত্র চুষিয়াছি, এমন সময়ে তাহাতে কর্তার নজর পড়িল। আর তাহা লইয়া যে কেলেঙ্কারীটা হইল তাহা ভাবিতেও প্রবৃত্তি

হয় না। সেদিন মনে হইয়াছিল, বুড়ার শুক্‌নো চামড়া-ঢাকা হাড় ক'খানা ঠিক এমনি করিয়া চিবাইয়া ফেলি! কিন্তু আমার শরীরের সমস্ত শক্তিকে আমার গলার শিকলটা যে মুঠা করিয়া ধরিয়া রাখিয়াছে! কোন্‌দিন ওটাকে সত্যই ছিঁড়িয়া ফেলিব। ইস, বেরালটা ঐ রক্তমাখা পালকগুলা চাটিতেছে, এই বন্দী অবস্থায় হাঁক দিয়া করিব কী, সে অমনি ছেনালী করিয়া আরো দেখাইয়া দেখাইয়া টুকিয়া টুকিয়া খাইবে! বেরাল জাতটাকে দেখিলে আমার সর্বশরীর জ্বলিয়া ওঠে। ছোট জাত, অথচ মানুষের কাছে তাহার আদর কম নয়। আমার পাওনা হাড়মাংসগুলা নিশ্চয়ই সে ফেলিয়া ছড়াইয়া আপন ইচ্ছামত খাইয়া বেড়ায়। একবার ছাড়া পাইলে তাহার উপযুক্ত শাস্তি সে পাইবেই পাইবে। ইস, কাঁচা রক্ত, একটা বিন্দুও যদি জিভে দিতে পারিতাম! এই এত বড় গুদাম ঘরটায় একটা ইঁদুর পর্য্যন্ত একবার উঁকি দেয় না। ইঁদুরের রক্ত, মনে করিলে কেমন গা ঘিন্ ঘিন্ করে। কিন্তু রক্ত, সে সব সমান, কাঁচা লোনা রক্ত! এই যা, রক্তের কথা মনে করিতে করিতে জিভের জলে মাটিটা পর্যন্ত ভিজিয়া গেছে! থুঃ! যাক্ ওসব কথা ভাবিয়া কাজ নাই। একটু কিছু খাইলে হইত। বাটির আলু চটকানোটার দিকে তাকাইতেও প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু মুরগীগুলা কী আনন্দেই না কপ্ কপ্ করিয়া তাহা গিলিয়া ফেলে! খানিকটা ত খাইলাম, বাকিটা পরে চেষ্টা করিয়া দেখা যাইবে। এখন একটু আরাম করিয়া শোওয়া যাক্। ছোট্ট হাঁসের বাচ্চাটা বেপরোয়াভাবে অন্ধের মত এদিকে আসিতেছে। আর একটু আগাইয়া আসুক না। নাঃ, কিছুদুর আসিয়াই থামিয়া গেল। সমস্ত জানোয়ারগুলা আমার চারিপাশে একেবারে গা ঘেঁসিয়া ঘেঁসিয়া ঘোরাফেরা করিতেছে, যেন তাহারা দল বাঁধিয়া আমায় ব্যঙ্গ করিতে আসিয়াছে। একবার ছাড়া পাইলে সমস্তগুলার ঘাড় ছিঁড়িয়া উপযুক্ত

শিক্ষা দিয়া দিতাম। একটার পর একটার টুঁটি টিপিয়া সমস্ত তাজা রক্ত পান করিয়া লইতাম, তারপর মাংস ও পেশীসংলগ্ন হাড়গুলাকে দিনের পর দিন ধরিয়া চিবাইতাম। কিন্তু এই শিকলটা, যেদিকে ফিরি ওটা সর্বক্ষণ আমার গলা ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে ফেরে। ওটাকে কী করিয়া কাবু করা যায় সেই সম্বন্ধে কয়দিন ধরিয়া ভাবিতেছিলাম, না? তাইত, কী করিয়া উহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়! ওটাকে ছাড়াইবার জন্য সেদিন যখন রাগের মাথায় মক্ষমভাবে কামড়াইয়া ধরিলাম, তখন আমার জিভ কাটিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল। উহার সবাঙ্গে দাঁত, সেই দাঁতগুলা মেলাইয়া সেদিন সে আমার দিকে চাহিয়া খুব খানিকটা হাসিল। মাথাটা নীচু করিয়া দুই পা দিয়া আস্তে আস্তে ওটাকে কানের উপর দিয়া হয়তো গলাইয়া দেওয়া যায়। না, কান পর্য্যন্ত আসিয়াই আবার ওটা ঝনাৎ করিয়া ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়ে। টিনের দেওয়ালটার উপর ঘসিলেও ওটাকে কাবু করা যায় না! কিন্তু সেই ঘর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ঐ দাঁতগুলাকে আমার গলার উপর সে অতি নির্মমভাবে কসকসে করিয়া বসাইতে থাকে। কিন্তু——এইবার একটা বেশ রীতিমত মৎলব মাথায় আসিতেছে, কিন্তু তাহাকে যেন ঠিক ধরিতে পারিতেছি না। দাঁড়াও দেখি, এই শিকলটা ত ঐ আংটাটার সঙ্গে বাঁধা, আর আংটাটা? ওটা মাটির মেঝের সঙ্গে কী এক অদ্ভুত উপায়ে আটকানো। হাত-পায়ের নখগুলো কি একেবারে ভোঁতা হইয়া গেছে! ঐ আংটাটার চারিপাশে খুঁড়িলেই ত সব গোল চুকিয়া যায়! কিন্তু অতি সন্তর্পণে কাজটা করিতে হইবে। এখন ঠিক সুবিধা হইবে না, বুড়ী আবার খাবার লইয়া এখনই আদিখ্যেতা করিতে আসিবে। একটু গা-ঢাকা মত হইয়া আসুক, এবং জন্তুগুলা সব শুইতে যাক্। কিন্তু কাজটা আজই রাত্রে শেষ করা চাই। ঐ শাদা মোরগটাকে আগে খতম করিব, তারপর ঐ বোকাগোছের

হাঁসটাকে, তারপর ঐ খোঁড়া পেরুটাকে, তারপর, তারপর একে একে সব কয়টাকে সাবাড় করিতে হইবে। হুঁ, কিন্তু জন্তুগুলাকে রাখিব কোথায়? গুদাম-ঘরে রাখিলে কর্তা কালই আসিয়া সেগুলাকে টানিয়া বাহির করিবে এবং একটা কেলেঙ্কারী হইয়া যাইবে। না না, এ বাড়ীর ত্রিসীমানায় নয়, কিন্তু কোথায় রাখা যায়? খুব দূরে কোথাও, যেখানে মানুষের যাওয়া-আসা নাই। ঐ দূরে ঝাউবনটায় যেখানে ওপাড়ার ফীগার সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, সেখানে পুঁতিয়া রাখিলে কেমন হয়? কেন সে ত খাসা মৎলব, কেহ টের পাইবে না। ফীগাটার সম্প্রতি কতকগুলা এণ্ডাবাচ্চা হইয়াছে, তাহার দেমাকে সে পাড়ার কাহারও দিকে ফিরিয়াও তাকায় না, আহার-নিদ্রা ত্যাগ করিয়া সে স্রধু ঐ কেঁচোর মত বাচ্চাগুলাকে লইয়া নাকি রোদে একপাশে পড়িয়া থাকে। ফীগাকে লইয়া তাহার এক অনুগামীর সঙ্গে একদিন বেশ একটু মন-কসাকসি হইয়াছিল, মনে আছে। দুই জনে যখন ফীগার মন কাড়িবার জন্য রীতিমত মল্লযুদ্ধে প্রস্তুত হইয়া উঠিয়াছি, এমন সময়ে ঐ বোট্‌কা গন্ধ-ওয়ালা বুড়ীটা একটা চ্যালাকাঠ লইয়া আমাকে শাসাইল, এবং পরে কর্তা আসিয়া জোর করিয়া আমাকে শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখিল। ইহাতে উক্ত অনুগামীটি ফীগাকে ইশারা করিয়া একটু দূরে লইয়া গেল। কথাটা মনে করিলে আজও আমার ভিতরটায় কিসের একটা ভোঁতা ব্যথার মত বেদনা অনুভব করি। আজ রাত্রে একবার ওপাড়ায় যাইব নাকি? ফীগা সারা রাত ছাড়া থাকে, রাত্রির নিঃসঙ্গতায় হয়তো আজ আমায় সে প্রত্যাখ্যান করিবে না। আর প্রত্যাখ্যান করিলেই বা ক্ষতি কী, আপন জঙ্ঘার পেশীগুলা ত আজও শিথিল হইয়া যায় নাই! ফীগাই ত কত ছল করিয়া আমার আস্তানার আশেপাশে ঘোরাঘুরি করিত, তবে সে ঐ অপগণ্ডগুলা জন্মাইবার কিছু পূর্বে। কিন্তু আজ সে পাঁচ ছেলের

মা হইয়া উঠিয়া এমন কাহার কি মাথা কিনিয়াছে! ফীগা যদি প্রত্যাখ্যান করে, লেডী আছে, আর লেডীরও যদি মন না উঠে ত মাঠের মাঝখানের ঐ বাড়ীটার নরাও ত আজ বাঁচিয়া আছে, যদিও তাহার বয়স কম হয় নাই এবং দাঁতগুলা রীতিমত আল্‌গা হইয়া পড়িয়াছে। কাজ আরম্ভ করিব না কি? না, একটু অপেক্ষা করা যাক্। ইস, শিকলটার দিকে তাকাইয়া যেন তর সহিতেছে না! ঐ যে বুড়ী আসিতেছে। ৎস্রীগান্, ৎস্রীগান্! ভালো মানুষের মত একটু মাথাটা তুলিয়া লেজটাকে বার দু'এক নাড়া যাক্। বুড়ী খাবার রাখিয়া চলিয়া গেল। দেখিতে দেখিতে বেশ একটু গা-ঢাকা মত হইয়া আসিয়াছে। জানোয়ারগুলাকে খাওয়াইয়া বুড়ী ঐ ঘরটায় বন্ধ করিল। একটা শোরের বাচ্চার বোধ করি খোঁজ মিলিতেছে না। বুড়ী ডাকিল, "মালুংকী, মালু—মালু—মালূ—উ।" ডাক শুনিয়া আধো-খোলা দরজা দিয়া ভিতরের সব শোরের বাচ্চা কয়টা বাহির হইয়া আসিল। ঐ যে হারানো বাচ্চাটা কোথা হইতে ছুটিয়া আসিল। সব কয়টাকে একসঙ্গে ঘরে পূরিয়া বুড়ী অন্ধকারে মিশিয়া গেল। তাহার মাথায় বাঁধা শাদা কাপড়টা এখনও দেখা যাইতেছে। এইবার সে আপন ঘরে ঢুকিয়া দোর দিল, হুড়্‌কার আওয়াজ পাইলাম না!

সন্ধ্যা হইবার কিছু পরেই সারা গ্রামখানা যেন অন্ধকারে একেবারে হারাইয়া যায়। সুধু ম্লিনারচ্যিকের অতুল বৈভবের সাক্ষ্যস্বরূপ তাহার বাড়ীর জানালা দিয়া খানিকটা আলো বিজন সমুদ্রের মাঝে জনহীন আলোকস্তম্ভের মত জাগিয়া থাকে। রাত একটু গভীর হইয়া আসে,

বুড়াবুড়ী শুইতে যায়, জানালার আলোটা ক্রমে মুমূর্ষুর চোখের মত নিস্তেজ হইয়া আস্তে আস্তে নিবিয়া যায়। তখন এই ক্ষুদ্র মানবগোষ্ঠীর শেষ চিহ্নরূপে গ্রামের পথটা ভদ্‌কা-খোরের মত ধূলায় লুটাইয়া যেন নেশায় ভোর হইয়া অসাড়ভাবে পড়িয়া থাকে।

সেদিন আকাশে একটিও তারা নাই, গভীর রাতে হঠাৎ মেঘ করিয়া ঝড় উঠিল। ম্লিনারচিক্যের বাড়ীর চারিপাশের তপলা-গাছগুলা পরস্পরের গায়ে পড়িয়া সির্-সির্ শব্দে কী একটা বিষয় লইয়া কানাকানি করিতে বসিল। ঐ ঝাউবনটার দিক হইতে মাঝে মাঝে একটা চাপা গোঙানীর শব্দ বাতাসে ভাসিয়া আসে, যেন কে কাহার গলাটা আলু ছাড়াইবার ছুরী দিয়া পেঁচাইয়া পেঁচাইয়া কাটিতেছে। বুড়ী ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিয়া স্বামীকে জাগাইল। উভয়ে অনেকক্ষণ ধরিয়া কান পাতিয়া শুনিল, এবং একে একে সমস্ত সন্তগণের নাম করিয়া আবার পাশ ফিরিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। হু-হু করিয়া বৃষ্টি নামিল, এবং ঝড় ও বৃষ্টিতে ম্লিনারচিক্যের সারা আঙ্গিনাটায় তুইটা শকুনীর মত ঝটাপটি করিতে লাগিল। মাঝে মাঝে শূয়ারখানা হইতে শিশুর কান্নার মত শব্দ শোনা যায়, হাঁস ও মুরগীর ঘরটায় অনেকগুলা পাখা একসঙ্গে ঝাপটাইয়া উঠে, আবার সব থামিয়া যায়, এবং থাকিয়া থাকিয়া ঐ বনটা হইতে গোঙানীর শব্দটা বৃষ্টিকে ছাপাইয়া উঠে। মানুষের স্নায়ুগুলাতে ভয় বলিয়া যে পদার্থটা রক্তের সঙ্গে মিশিয়া থাকে তাহা যেন এই তুর্যোগের রাতে ছাড়া পাইয়া প্রেতের মত হা-হা করিয়া বেড়াইতেছে।

ভোরের দিকে বৃষ্টি থামিল, এবং সকাল হইতেই ম্লিনারচ্যিকের আঙ্গিনাটা রোদে ভরিয়া উঠিল। বুড়ী তুয়ার খুলিয়া বাহিরে আসিয়াই হতবুদ্ধির মত দাঁড়াইয়া রহিল। তুয়ারের কাছে ভিজা ঘাসের উপর তুইটা হাঁস ও একটা মোরগ ঘাড় নেতাইয়া পড়িয়া আছে। তাড়াতাড়ি

হাঁস ও মুরগীর ঘরের দিকে ছুটিয়া গেল, দেখিল দুয়ার খোলা, শুধু একটা মুরগী এক কোণে বসিয়া ডিমে তা দিতেছে, তাহার মুখে তখনও আতঙ্কের ছাপ লাগিয়া আছে। ডাকিল, "মালূংকী—মালু—মালু—উ!" কিন্তু একটা শূকরশাবকও সে-ডাকে ছুটিয়া আসিল না।

ম্লিনারচ্যিকের মাথায় যেন সেইদিনের বসন্তের ঐ আকাশখানা একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহার আজীবন-সঞ্চিত ডলারের পুঁজির যে দশগুণ সুদের হিসাব সে মনে মনে কষিয়া রাখিয়াছিল, তাহার মনের সেই হিসাবের খাতাখানাকে কে এক মুহূর্তে ছিঁড়িয়া কুটিকুটি করিয়া ফেলিল। যে প্রতিবেশী তাহার এই সর্বনাশ করিল তাহার রক্ত দর্শন করিয়া তবে সে জলগ্রহণ করিবে, এইরকম কী একটা শক্তগোছের শপথ করিল। কিন্তু উঠানের কাদার উপর কিসের একটা চিহ্ন দেখিয়া সে একেবারে হতবাক্ হইয়া গেল। সারা আঙ্গিনা-টায় কে যেন শিকলের মত কী একটা টানিয়া টানিয়া বেড়াইয়াছে। হাঁস ও মুরগীর ঘর হইতে রেখাগুলা আঁকিয়া বাঁকিয়া আলুর ক্ষেত পার হইয়া বনের দিকে চলিয়া গেছে। যে-ব্যক্তি একাজ করিয়াছে সে যে বহুবার আনাগোনা করিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু দাগগুলা স্থানে স্থানে স্পষ্ট শিকলের। কী ভাবিয়া ম্লিনারচ্যিক্ হাঁকিল, "ৎস্‌্যীগান্"! কোন উত্তর আসিল না। আবার ডাকিল, "ৎস্‌্যীগান্, ৎস্‌্যীগান্!" ৎস্‌্যীগান্ আপন গহ্বর হইতে মুখ বাড়াইয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। "ৎস্‌্যীগান্, আয় এদিকে!" ৎস্‌্যীগান্ এবার লজ্জার মাথা খাইয়া একেবারে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। আংটায় বাঁধা শিকলটা তাহার চিরপুরাতন সঙ্গীর মত তাহার সঙ্গে সঙ্গে বাহির হইয়া আসিল। ম্লিনারচ্যিক্ গর্জিয়া উঠিল, "ৎস্‌্যীগান, তোর এমন কাজ!" ৎস্‌্যীগান্ যেন লজ্জায় মরিয়া গিয়া মাথাটা নীচু করিয়া নিতান্ত সঙ্কোচভরে তাহার অবশিষ্ট লেজটুকু নাড়িতে

নাড়িতে শাস্তির প্রতীক্ষায় স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। স্লিনারট্যিক্ উঠান হইতে একটা ভাঙ্গা গাড়ীর ধুরা কুড়াইয়া লইয়া ৎস্নীগানের লজ্জা-বনত মাথার উপর তাহার আজীবন-সঞ্চিত ডলারের পুঁজির ধ্বংসাধনের প্রতিশোধ লইল। ৎস্নীগান্ যেমন হতবুদ্ধির মত তাকাইয়া ছিল তেমনই তাকাইয়া রহিল, স্বধু তাহার মাথার মধ্যস্থল ফাটিয়া কয়েক বিন্দু রক্ত তাহার মুখের উপর গড়াইয়া পড়িল। শিকলটাকে লইয়া সে ঐখানেই ঐ ভিজা মাটির উপর ধীরে ধীরে শুইয়া পড়িল।

ভারশৌ,

৩রা জুলাই, ১৯৩৭।

ইমিয়েনীন্সী

সে-বছর "স্থেন্ মাত্কি", * রবিবার ও স্তানিস্লাভের "ইমিয়েনীন্সী" † একসঙ্গে পড়িল। তাহাতে দুই দুইটা ছুটি একেবারে মাঠে মারা যাইলেও পানী ‡ স্তানিস্লাভার অপরিসর গৃহে অতিথি-সমাগম অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা কিছু কম হইল না। দুই মেয়ে, জামাই ও বড়ছেলে নানা বর্ণ ও নানা আকারের পুলিন্দা ও পুষ্প সমভিব্যাহারে একে একে প্রবিষ্ট হইল, এবং মার হস্তচুম্বন করিয়া স্থেন্ মাত্কি ও নামোৎসবের দুইটা কর্ত্তব্যই একসঙ্গে সারিয়া লইল।

* "মা'র দিন"—অর্থাৎ মাতৃ-উৎসব। ঐ দিনে সমগ্র পোলদেশে মাতৃ-উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

† ইউরোপের বহু দেশে জন্মোৎসবের পরিবর্তে নামোৎসব অনুষ্ঠিত হয়, অর্থাৎ ব্যক্তিবিশেষের নাম অনুযায়ী যথা য়ান্ (জন্), প্যত্র (পিটার) ইত্যাদি—উক্ত সন্তগণের উৎসবের দিন জন্মদিনরূপে রক্ষিত হয়।

‡ শ্রীমতী বা মহাশয়া। পোলভাষায় "আপনি" অর্থেও "পান্" (পুং) বা "পানী" (স্ত্রী) ব্যবহৃত হয়।

পানী স্তানিস্লাভা কৃত্রিম রোষ সহকারে ভর্ৎসনা করিলেন, "দেখোদেখি পাগলা ছেলেমেয়েদের কাণ্ড! এই সব ছাইভস্ম কিনে পয়সা নষ্ট করা! তোরা সবাই মানুষ হয়েচিস্, বেঁচে বর্ত্তে' আচিস্, তাতেই আমার সুখ। এই সব জিনিষ পত্র দিয়ে কি আমার সে-সুখ বাড়বে রে?"

উত্তরে মেয়ে, জামাই ও বড়ছেলে পুনরায় মা'র হস্ত চুম্বন করিল। ফুলের মোড়কগুলা খুলিতে খুলিতে পানী স্তানিস্লাভা নানা আনন্দোক্তি করিতে লাগিলেন, "বাঃ কী চমৎকার ফুল! আজালিয়া রোদোদেন্দ্রন্, কন্‌ভালিয়া, নার্সিজ, এই যে মাসে অমন মাগ্‌নোলিয়া কোত্থেকে পেলিরে? ভারী চমৎকার, ভারী চমৎকার! তবে পয়সা নষ্ট করা। এবার যা করেচিস্ তা করেচিস্, আর যেন কিনিস্‌নে আমার জন্যে এসব বাছা। তোরা ত আর রাজা-রাজড়া ন'স্ বাপু! হ্যাঁ, কী বলছিলুম, ক্রাকুফ্ থেকে স্তেফান্ টেলিগ্রাম করেচে, আর সকাল হ'তে না হ'তেই পিওন এক মস্ত মোট নিয়ে হাজির! স্থির হ'য়ে ব'স তোরা, দেখাচ্চি। পাগল ছেলেটা, লিখেচে আস্‌তে পারবে না, ছুটি পায়নি বলে'। তার ওপর কচি মেয়েটা, তাকে নিয়ে নাড়ানাড়ি করা! না এসেচে ভালই ক'রেচে। দাঁড়াও দেখাচ্চি কী পাঠিয়েচে। কেবল পয়সা নষ্ট করা!" বলিতে বলিতে পানী স্তানিস্লাভা চক্‌চকে নিকেল-করা কী একটা কল আনিয়া হাজির করিলেন।

"দেখো দেখি পাগল ছেলেটার কাণ্ড!" আনন্দাশ্রু সম্বরণ করিয়া পানী স্তানিস্লাভা কহিতে লাগিলেন—"দেখো দেখি একবার, এই সব কিনে পয়সা নষ্ট করা। ঐ ত রোজগার, তার ওপর বৌ, মেয়ে, দেখো দেখি পয়সা নষ্ট করা!" তাঁহার আদরের ছোট ছেলে স্তেফান্ যে তাঁহাকে সকলের অধিক ভালোবাসে, এই গর্বে তাঁহার মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। "এই সব কল-কব্জা নিয়ে আমার হবে কী বল তো!

আমাদের সেকেলে কয়লার উনুন কি খারাপ বাপু? তা আজকাল সব নতুন বিধেন! কয়লা গেল, এল গ্যাস, আবার এই নতুন ফ্যাশান্, ইলেকৃট্রিক্! ইলেকৃট্রিকের উনুন, বলে, মা ধোঁয়ায় রাধতে তোমার কষ্ট হয়, চোখ জ্বলে, ইলেকৃট্রিকের সে বালাই নেই। তাছাড়া এতে নাকি ঘর নোংরা হয় না। পাগল ছেলেটা।"

নিকেল-করা এই অভিনব যন্ত্র দর্শনে মেয়ে, জামাই ও বড়ছেলে মিশ্রিত আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিল, "বাঃ বাঃ! সত্যিই কী চমৎকার! এবার মা, শুয়ে শুয়েই তুমি চায়ের জল ফোটাতে পারবে। কেৎলীতে জল ভরে' শোবার আগে উনুনের ওপর বসিয়ে রাখা, আর সকালে শুয়ে শুয়েই বিছানা থেকে হাত বাড়িয়ে স্থইচটা টিপে দেওয়া!"

পানী স্তানিস্লাভা গর্বভরে কহিলেন, "শুধু তাই নয়, এ উনুনে নাকি পোড়া-ঝোড়ারও কোন বালাই নেই। রান্না চড়িয়ে পার্কে দু'চক্কর দিয়ে এসো, রান্না তৈরী হ'য়ে আচে, অথচ একটী আনাজ পর্যন্ত পোড়েনি। তবে পয়সা নষ্ট করা! যা বাছা তোরা, ঐ বড় ঘরটায় গিয়ে বস্‌গে যা।" পরে স্বর নামাইয়া, একপ্রকার চুপি চুপি বলিলেন, "ভাড়াটেরা মানুষ ভারী ভালো, এই দেখো না আমার এই ত একখানা ঘর, তার আধখানা আবার রান্না ঘর। তা আজ সকালে পানী য়ানীনা এসে বললেন, 'পানীর ঘরে আজ লোকজন আসবে, তা পানী আজ আমাদের ঘরটাতেই লোকজন বসাতে পারবেন।' যা বাপু তোরা বড় ঘরটায় গিয়ে ব'স্‌গে যা, আমি এক্ষুনি আস্‌চি। পান্না* কাত্যাঝীনা এসেছেন, তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা ক' গে যা, উনি একলা বসে' আচেন। ভাড়াটেরা মানুষ ভালো তবে অচেনা, অজানা মানুষ, পান্না কাত্যাঝীনার একটু সমীহ হ'চ্চে বোধ হয়। যা, তোদের উনি জানেন শোনেন, যা বাপু তোরা।"

*কুমারী।

উক্ত "বড় ঘর" হইতে তখন পান্না কাতাঝ্যীনার অপ্রতিহত কথার ছোট বড় ঢেউ, দরজার ফুটা-ফাটা দিয়া ভাঙ্গা নৌকার খোলের ভিতর যেমন অবাধে জল আসিয়া ঢোকে, তেমনি করিয়া কুল-কুল শব্দে প্রবেশ-কক্ষকে ভরিয়া ফেলিতেছে। দরজাটা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই পান্না কাতাঝ্যীনার উল্লসিত চীৎকার সকলকে অভ্যর্থনা করিল, "ওমা আজ কতদিন তোমাদের দেখি নি গো! আট বচ্ছর আগে, সেই যে পানী স্তানিস্লাভার ইমিয়েনীন্স্বীতে দেখা হয়, তার পর আর তোমাদের দেখি নি। তা পানী স্তানিস্লাভার ছেলেমেয়েরা অমন ডাগর হয়ে উঠেচে যে আর তুই-তুকারী করবার জো নেই। পান্ ভীতল্দ্ ত একেবারে মস্ত পুরুষ মানুষ হ'য়ে উঠেচেন!"

ত্রিশ বছর বয়সেই পান্ ভীতল্দের মাথার মধ্যস্থল একেবারে পালিশ করা হাতীর দাঁতের মত চক্‌চক্ করিতেছে। পান্না কাতাঝ্যীনার হস্ত-চুম্বন করিয়া সে একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া মিনিট গুনিতে বসিল, এখন আটটা বাজিয়া সতেরো মিনিট, ন'টায় তাহার ইয়ার স্তানিস্লাভের বাড়ী যাইতে হইবে। সেখানেও ইমিয়েনীন্স্বী, স্তানিস্লাভ অবিবাহিত, তাহার ঘরে ডান্‌দিক্‌কার দেওয়াল-আলমারীতে নানা রঙের ও নানা আকারের বোতলগুলা এবং টেবিলে লোন্‌তা "শ্লেজ্" মাছ* ও "কাভিয়ারের"† কথা মনে করিয়া তাহার জিভটা শুকাইয়া উঠিতে লাগিল।

দুই মেয়ে ভান্দা ও হান্‌কা পান্না কাতাঝ্যীনার সহিত চুম্বন-বিনিময় করিয়া দেওয়ালের কাছে দিভানটার উপর বসিল। জামাই তাহার কুটুম্ব-সুলভ লজ্জা সহকারে একখানা চেয়ারের পিঠ ধরিয়া দাঁড়াইয়া

*ইংরেজী "হেরিং", কতকটা ইলিশ মাছের মত।

†এক প্রকার মাছের ডিম, রুশিয়া ও পোলদেশে বিশেষ পরিচিত।

দাঁড়াইয়া স্মিতহাস্যে ঘরখানাকে উদ্ভাসিত করিতে লাগিল। তাহার কাল-শুভ্র মাথাটার ভিতর "বসিব" কি "বসিব না" এই দুইটা প্রশ্ন ঢেঁকি-দোলনার মত দুলিতে থাকিল, এবং যতই সময় যাইতে লাগিল, বসা তাহার পক্ষে ততই দুরূহ হইয়া উঠিল। তাহার মনে হইল যেন ঘরসুদ্ধ সকলেই তাহাকে ইচ্ছা করিয়া বসিতে বলিতেছে না! সে যে ৬২ বৎসর বয়সে ২৫ বছরের ভান্দাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করিয়াছে, এবং তাহাতে যে ভান্দার আত্মীয়স্বজন কেহ খুসী হয় নাই, সেই দোষ-বোধটা তাহাকে অতিশয় পীড়া দিতে লাগিল। তাই তাহার বাধানো, বিবর্ণ দাঁতগুলাকে বাহির করিয়া সে মমীর মত হাসিতে হাসিতে বসিবার সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ভান্দা দিভানের উপর পাতা সতরঞ্চীর ঝালরগুলা আঙ্গুলের চারিপাশে জড়াইতে লাগিল এবং তাহার ছোট বোন হান্‌কা দেওয়াল-পাঁজিতে আঁকা কুকুরটার দিকে তাকাইয়া ভাবিতে লাগিল, সে যখন বিবাহ করিয়া ঘর-সংসার পাতিবে, তখন ঠিক ঐ জাতের একটা কুকুর সে পুষিবেই পুষিবে। এমন সময়ে কল-ঘরের ঝারার মত পান্না কাতাঝ্যীনার কথার ঝাপটা ভান্দার আনত মুখের উপর একেবারে উছলিয়া পড়িল—

"বলি পানী ভান্দো,* পানীকে দেখে আমার বোন্‌ঝি বার্‌বারার কথা মনে পড়ে। একেবারে হুবহু বসানো, সেই মুখ, সেই চোখ, সেই নাক, সেই ভুরু, সেই চুল, এমন কি গায়ের রংটি পর্যন্ত। পানীকে দেখে কে বলবে যে পানী আমার বোন্‌ঝি বার্‌বারা ন'ন্? পানী যেই ঘরে ঢুকলেন, আমি অমনি একেবারে চমকে উঠলুম, বলি ওমা, পানী স্তানিস্লাভার বাড়ীতে বার্‌বারা কোত্থেকে গা! তার পর অনেকক্ষণ ঠাওর করে দেখলুম যে, না এ নিশ্চয়ই পানী স্তানিস্লাভার বড় মেয়ে

*সম্বোধন কারক।

পানী ভান্দা! তা ভগবানের এমনি ছিষ্টি যে বয়েসটাও কি ঠিক এক হ'তে হয় গা!"

ভগবানের সৃষ্টি সম্বন্ধীয় এই দার্শনিক গবেষণায় যোগ দিয়া পানী-স্তানিস্লাভার ভাড়াটে পানী য়ানীনা তাঁহার গ্রাম্য উচ্চারণকে যথাসম্ভব শহুরে এবং কণ্ঠস্বরকে তদুপযুক্ত শ্রুতিমধুর ও সভ্য করিয়া বলিলেন, "হাঁ ভগবানের সিষ্টির কথা যদি বলেন পানী কাত্যাঝ্যীনো, ত সুধু মানুষে মানুষেই যে মিল বা সাম্য পাওয়া যায় তা নয়, উৎভিদ্ এবং জীবজগতেও এমন মিল দেখা যায় যে, সত্যই আশ্চর্য না হয়ে থাকা যায় না। লক্ষ লক্ষ গাছ পাতা, তার একটাও আর একটার সঙ্গে মেলে না, আবার এমনও দেখা যায় যে দু'টো পাতায় একেবারে হুবহু মিল!"

পান্না কাতাঝ্যীনার কথার ঝারা হু-হু করিয়া বহিয়া চলিল ঃ—

"তা পানী যা বললেন তা একেবারে খাঁটী সত্যি। ব'লবো কি, প্রশেঁ পান্স্তভা,* পান্স্তভো† শুনলে বিশ্বেস করবেন না। ভীল্নোয় থাকবার সময় একটী কুকুর পুযেছিলুম, তার নাম নেরো। নেরো আমার ঐ দেয়ালের ছবির কুকুরটার মতন কতকটা। কান দু'টো ঝোলা ঝোলা, একেবারে কুচকুচে কালো, সুধু ন্যাজের ডগাটা শাদা। ও-জাতের কুকুর প্রায়ই কালো হয়, নেরোর শুধু ন্যাজের ডগাটা একটু শাদা। তা ব'ল্বো কী, প্রশেঁ পান্স্তভা, একদিন বিকেলের দিকে বসে' আছি পার্কে,

*পোল ভাষায় ভদ্রতার পরিচায়করূপে কথার মাঝখানে "প্রশেঁপানা" (পুং) "প্রশেঁপানী" (স্ত্রী) ও "প্রশেঁ পান্স্তভা" (বহুবচন, স্ত্রী ও পুং) ব্যবহৃত হয়। কতকটা ইতালীয় ভাষার "প্রেগো"র মত।

†আপনারা (পুং ও স্ত্রী)। তদনুরূপে, "পানভিয়ে"—আপনারা (পুং), "পানিয়ে"—আপনারা (স্ত্রী)। উক্ত সর্বনাম ও অন্যান্য পোলীয় শব্দ গল্পের স্থানীয় আবহ বজায় রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হইল।

দেখি নেরো চলেচে কোন্ এক পানের সঙ্গে ! আমি ত অবাক্ ! বলি, এই মাত্তর নেরোটাকে গিলিয়ে কুটিয়ে দোর বন্ধ করে' একটু বেড়াতে বেরিয়েচি তা সে বেরুলো কোনখান্ দিয়ে ! ডাকলুম্ 'নেরো ! আয় এদিকে !' ডাক শুনে নেরো একবার ফিরে তাকালে, কিন্তু ভাবটা দেখালে যেন সে আমায় জীবনে কক্‌খনো দেখেনি। ফিরে একবার তাকিয়ে সে চললো সেই পানের সঙ্গে সঙ্গে। ভাবলুম, নেরোকে চোরে নিয়ে যাচ্চে। ছুটলুম পিছু পিছু, যতবার ডাকি 'নেরো', নেরো ততবারই ফিরে তাকায় অথচ ভাবটা দেখায় যেন সে আমায় চেনেও না। ধমক দরে ব'ললুম, 'হতভাগা কুকুর, কোন্ এক অজানা মানুষের সঙ্গে চলেচো গেলবার লোভে, জানো না যে তোমায় চোরে নিয়ে যাচ্চে ? জ্যান্ত ছাল ছাড়িয়ে যে মারবে তোমায় !' জানেন ত পান্‌স্ত্‌ভো, শোনা যায় যে হারানো কুকুর ধরে' চোরে দস্তানার কারখানায় বেচে দেয়, তার পর জ্যান্ত ছাল ছাড়িয়ে সেই ছালে দামী দামী দস্তানা তৈরী হয় ? আমি কেঁদে মরি, বলি নেরোর আমার সেই দশাই ক'রবে ওরা। ছুটতে ছুটতে কাছে গিয়ে সেই পান্‌কে ডেকে বললুম, 'বলি, আমার কুকুরটাকে ধরে' নিয়ে যাচ্চো, এক্ষুনি ছেড়ে দাও, তা না হ'লে পুলিশ্ ডাকবো'। আমার কথা শুনে সেই পান্ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ব'ললে, 'পানীর কুকুর ! অর্থাৎ ?' বলি, 'অর্থাৎ আবার কী ? এ আমার কুকুর !' বলে, 'পানীর মাথার একটু দোষ আচে কী ?' ধমক দিয়ে বলি, 'এক্ষুণি যদি ছেড়ে না দাও ত পুলিশ্ ডেকে একটা অনর্থ কাণ্ড ক'রবো !' বলে, 'হয় পানীর মাথা খারাপ আর না হয় পানী তামাসা ক'রচেন। এ আমার কুকুর নেরো !' চেঁচামেচি শুনে লোক জড় হয়ে গেল, পুলিশ্ এলো। তবুও সেই পান্ বলে, 'এ আমার কুকুর নেরো।' আমি বলি, 'অমনি ব'ললেই হ'লো, আমার কুকুর নেরো, ও-যে আমার দুধের বাচ্চাটি থেকে

মানুষ করা নেরো গা!' পুলিশ্ সেই পান্‌কে নিয়ে চ'ললো থানায়, আর সঙ্গে সঙ্গে আমি! কুকুর-চোর দেখে আমাদের পেছনে পেছনে জোয়ারের মতন লোক চলেচে। নেরো কী ভেবে' আমায় দু'একবার শুঁকে ঘেউ ঘেউ করে' ডেকে উঠলো। ধরতে যাই ধরতে দেয় না, কেবল ঘেউ ঘেউ করে' ডাকে। থানায় যাবার পথে আমার বাড়ী পড়ে। পুলিশ্‌কে বলি, 'বাপু দাও আমার কুকুর আমায়, নিশ্চয় ওর একটা অসুখ-বিসুখ ক'রেচে।' তা পোড়া কুকুর ধরতে দেবে না, কেবল ঘেউ ঘেউ করে' আমায় কামড়াতে আসে! তার পর বাড়ীর কাছে এসে আমি একেবারে থ হ'য়ে গেলুম! দেখি, জান্‌লার গরাদ দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আমার নেরো! দেখো দিকিন্ কী কাণ্ড! আমি ত লজ্জায় মরি। দু'টো কুকুরে একেবারে হুবহু মিল, এমন কি নামটা পর্যন্ত এক!''

সুবিধা পাইয়া জামাই চেয়ারটার উপর বসিয়া পড়িয়া ভগবানের সৃষ্টি সম্বন্ধীয় কী একটা অতিশয় জ্ঞানী গবেষণার উত্থাপন করিতে যাইতেছে এমন সময়ে আচম্‌কা ঢেউয়ের মত পান্না কাতাঝ্যীনার বাক্য-স্রোত সকলকে ভাসাইয়া লইয়া চলিল—

''তারপর কী বলছিলুম, প্রশেঁ পান্‌স্ত্‌ভা, হ্যাঁ, মানুষে-মানুষে মিল এমন হয় যে দু'জন লোককে চেনা পর্যন্ত যায় না। যমজে-যমজে মিল অনেক সময় হয় বটে। কিন্তু দু'টো মানুষ, একেবারে অচেনা, অজানা, কোন সম্পর্ক পর্যন্ত নেই, কেমন করে' যে একরকম হয় তা ভগবানই জানেন! পান্‌স্ত্‌ভোকে ব'লবোকি, একবার ভারী অপ্রস্তুতে পড়েছিলুম। আমার বোন্‌ঝি বার্‌বারার সই মাল্‌গোঝাতা বার্‌বারারই সমবয়সী। তার ভগ্নিপোত, বয়েস বছর পঁয়ত্রিশ হবে, সোঁদর-সুপুরুষ মানুষটো, তার ওপর ভারী সৌখীন, হাজার মানুষের মধ্যে তাকে চিনে নেওয়া যায়। চুল ওলটানো, চক্‌চকে বুরুশ-করা আমেরিকান্ জুতো পায়ে, ইংরিজি পোষাক

ছাড়া অন্য কোন পোষাক পরে না, রুমাল, টাই, শার্ট্, সমস্ত ইংরিজি, একেবারে লণ্ডনে তৈরী, হাতের দস্তানা জোড়াটা পর্যন্ত। বার্‌বারার সই মাল্‌গোঝাতার ভগ্নিপোতকে একবার যে দেখেছে সে আর ভোলেনি। তার চলার ধরণ, মুখের হাসি, সব একেবারে পেটেণ্ট্-করা, দস্তানা জোড়াটাকে হাতের মুঠোর মধ্যে ধরবার কায়দাটি পর্যন্ত! তা প্রশে পান্‌স্ত্‌ভা, একদিন চলেচি ট্রামে করে', দেখি ইষ্টিশানের কাছে বার্‌বারার সই মাল্‌গোঝাতার ভগ্নিপোত আমাদের গাড়ীটাতেই এসে উঠলো। চেনা মানুষ, তাই তার দিকে তাকিয়ে, একটু মুচকে হাসলুম। ওমা, তা সে এমন ভাবটা দেখালে যে আমায় জন্মে দেখে নি! বিচ্ছিরি ব্যাপারটা হ'য়ে গেল, হাজার হোক্ মেয়েমানুষ পুরুষমানুষের দিকে তাকিয়ে হাসা, লোকে ব'লবে কী গা! ভাবলুম, হয়তো আমায় চিনতে পারে নি। তাই কাছে গিয়ে ব'ল্‌লুম, 'নমস্কার'। ওমা, তা লোকটা একটা নমস্কার পর্যন্ত ক'রলে না! বলি, 'মাপ্ ক'রবেন্ পান্ মাল্‌গোঝাতার ভগ্নিপোত না?' বলে 'মাল্‌গোঝাতা, মাল্‌গোঝাতা!' ফেল্ ফেল্ করে' আমার মুখের দিকে তাকায়, বলে, 'আজ্ঞে না, পানী ভুল ক'রেচেন, আমি মাল্‌গোঝাতার ভগ্নিপোত নই, মাল্‌গোঝাতা বলে' আমার শালী-টালী কেউ নেই, আমি বিয়ে পর্যন্ত করিনি।' দেখো দিকিনি কী লজ্জার কথা, লোকটা কী ভাবলে বলো ত! অপ্রস্তুতের একশেষ! আমি তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেবেই দে ছুট! তার পর মাঝে মাঝে ট্রামে দেখা হয় লোকটার সঙ্গে, এখন সে নিজেই টুপি খুলে নমস্কার করে, এমন কি তার সঙ্গে দস্তুরমত পরিচয় পর্যন্ত হয়ে গেছে। দেকো দিকি ভগবানের ছিষ্টি!"

পান্না কাতাঝ্যীনার এই অসম্ভব কথা শুনিয়া ভাড়াটে পানী য়ানীনার পোষ্যপুত্র (জিজ্ঞাসা-চিহ্ন, কারণ পানী য়ানীনার বয়স ৩২ এবং পোষ্য-পুত্রের বয়স ২৩) পান্ তাদেউশ্ একটা বিস্ময়সূচক শব্দ করিয়া তাহার

অল্পবয়সী কবিদের মত ঝাঁকড়া চুলগুলা কানের দুইপাশে সরাইয়া দিয়া মুখখানাকে যথাসম্ভব ট্রাজিক্ করিয়া কয়েকদিন আগে পঠিত নিট্‌শের জ্ঞানগর্ভ বাণী হইতে কী একটা সৎকথা আওড়াইতে যাইতেছিল, সহসা পান্না কাতাঝ্যীনার বাক্যস্রোতে তাহার সে প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করিয়া দিল। শুক্‌নো রুটি গেলার মত একটা কোঁৎ করিয়া শব্দ করিয়া সে চুপ্ করিয়া রহিল। পান্না কাতাঝ্যীনা নূতন প্রসঙ্গের উত্থাপন করিলেন—

"পান্‌স্ত্‌ভো ভাগ্যে বিশ্বেস করেন?"

তাহার উত্তরে "হাঁ" বা "না" বলিবার পূর্বেই পান্না কাতাঝ্যীনা সুরু করিলেন—

"ভাগ্যে আমিও বিশ্বেস করতুম না, কিন্তু এমনসব কথা আমার নিজের জীবনে একেবারে হাতে হাতে ফলে' গেচে যে, এখন ভাগ্যে বিশ্বেস না করে' উপায় নেই। আমার জানা এক বেদে বুড়ী আচে, ব'লবো কী, প্রশেঁ পান্‌স্ত্‌ভা,সে যা-যা বলে' দিয়েছিল আজ পাঁচ বচ্ছর আগে তার একটু নড়চড় পর্যন্ত হয় নি। বলে, 'মা তুমি লটারীতে অনেক টাকা জিতবে, তবে তার কিছুদিন পরেই একটা ফাঁড়াও আচে, তা ভয় ক'রো না মা, লটারীতে অনেক টাকা জিতবে।' আমি ত হেঁসেই উড়িয়ে দিলুম, বলি, হ্যাঃ লটারীতে আবার নাকি জেতা যায়! সুধু টিকিট কেনার টাকাগুলো গরচা দেওয়া! তার পর সে বেদে বুড়ী, লটারীতে টাকা জেতার কথা সব ভুলে গিছলুম। বলি, গতর খাটিয়ে খাই মেয়েমানুষ, বরাতে যে কত সুখ তা তাতেই বোঝা যায়। আমার বাপ ছিলেন বড় মানুষ, কিন্তু বাবা মারা যাবার পর একটি ভাঙ্গা গ্রশ্‌ * পর্যন্ত কেউ না খাটিয়ে দেয় নি। তা যাই হোক্, একদিন আপিসের এক বুড়ো কেরাণী বলে, 'পানী লটারীর টিকিটের যদি অর্দ্ধেক কেনেন ত দুজ'নে মিলে একখানা টিকিট

* কাণা কড়ি।

কেনা যায়!' ঝুলো-ঝুলি, বলে, দশটা জ্লতী * দিয়ে টিকিট কেনবার পয়সা নেই, তাই পানী যদি আধখানা কেনেন ত পাঁচটা জ্লতী চেষ্টা-বেষ্টা করে' দেওয়া যায়।' বলি, বুড়ো মানুষ বলচে এত করে', দিলুম পাঁচটা জ্লতী। যাই টিকিট কেনা তার এক হপ্তা পরেই, প্রশেঁ পান্‌স্ত্‌ভা, আমার অমন পাকা চাকরীটি গেল। বিনি কারণে দিরেক্‌তরের সঙ্গে কী নিয়ে একটা মন-কষাকষি হ'লো, আমায় জবাব দিলে, বলে, পানীর বয়েস হয়েচে, আপিসের কাজ করতে পানীর কষ্ট হয়। দেখো দিকি, বলে বয়েস হয়েচে, এইত সবে চল্লিশ পেরিয়েচি! এখন যাই কোথা বলো ত, একলা মানুষ, বিয়ে করিনি, থা' করিনি, ছেলেপুলে নেই যে বুড়ো বয়েসে আমায় খাওয়াবে। মনে মনে বলি, হা আমার কপাল, আমার নাকি আবার কোনোদিন বরাত খুলবে! ব্যাগে গোটাকতক জ্লতী পড়ে আচে, আর সেই লটারীর টিকিটের আধখানা বেচে পাঁচটা জ্লতি পাওয়া যাবে, তাই দিয়ে কিছু না হোক্, অন্ততঃ দু'টো দিনও ত বাপু শুক্‌নো রুটি খেয়ে কাটানো যাবে। চললুম বোনের বাড়ীর দিকে, পথে ভাবচি, টিকিটটে বেচবো কি বেচবো না। হঠাৎ সেই বেদে বুড়ীর কথা মনে পড়লো। ভাবলুম, যাক্‌গে, দেখাই যাক্ না কী হয়, দু'দিন না হয় উপোস করেই কাটানো যাবে। বোনের বাড়ী না গিয়ে নিজের ঘরেই ফিরলুম। তারপর, প্রশেঁ পান্‌স্ত্‌ভা, ব'লবো কী, ব'ললে বিশ্বেস করবেন না, পরের দিন সকালে সেই বুড়ো কেরাণী এসে হাজির! বলে, 'এই দেখুন পানী টিকিটের নম্বরটা মিলিয়ে!' দেখি আমাদের টিকিটখানা জিতেচে, নগদ ৫০,০০০ জ্লতী!"

সংখ্যাটা উপস্থিত সকলকেই স্তম্ভিত করিয়া দিল। বড়ছেলে পান্ ভীতলদ্ দেনায় হাবুডুবু খাইতেছে, সে ভাবিতে লাগিল, ইস্ সংখ্যাটার

* দুই জ্লতী = ১৲ টাকা।

একটা শূন্য বাদ দিয়াও যদি সে কয়েক হাজার জ্‌লতী পাইত ত সে ছাত্র-জীবন হইতে সুরু করিয়া যত দেনা করিয়াছে তাহা সুদে আসলে শোধ করিয়া দিত এবং একটা পার্টি দিবার মত শ'খানেক জ্‌লতীও তাহার হাতে থাকিত। তা ভগবানের বিচারে সমস্ত পাকা পাকা নম্বরগুলা কত ঝাড়ুদার ও বিধবা বা অবিবাহিতা বুড়ীদের হাতে আসিয়া পড়ে।

জামাই তাহার পাকা চুলগুলার উপর হাত বুলাইয়া ভাবিতে লাগিল—ইস্‌, অতগুলা টাকা! সে যদি পাঁচ শত জ্‌লতীও জিতিতে পারিত ত পরের দিনই ইতালিয়া যাত্রা করিত, রোমা, মিলানো, ভেনেৎসিয়া! গন্দোলায় চড়িয়া ইতালিয়ার নীল আকাশের দিকে তাকাইয়া সে গন্দোলার মাঝিদের গান শুনিত। দূরে নানা গির্জার গম্বুজ দেখা যাইতেছে, ঠিক যেমন সে দেখিয়াছে ভারশৌএর* ইতালীয় কুল্পিবরফের দোকানগুলায়। নীল জল, নীল আকাশ, লাল ও সবুজ রঙের গন্দোলা, এবং গন্দোলার মাঝিদের মিষ্টি তেনর†। সুধু পাঁচ শত জ্‌লতী পাইলেই যথেষ্ট হইবে, এমন কি পারীটা পর্যন্ত দেখা হইয়া যায়। পারী সম্বন্ধে সে কত বই পড়িয়াছে, কত ছবি দেখিয়াছে। জোসেফিন্‌ বেকারও নাকি পারীতেই বেশীর ভাগ থাকে। পারীতে কত অদ্ভুত ব্যাপারই না ঘটে যাহার কথা সে অতি মনোযোগ সহকারে চায়ের দোকানে বসিয়া চিত্রিত সাপ্তাহিক-গুলাতে পড়িয়া থাকে। একখানা সাপ্তাহিকের একটি বিশেষ ছবির কথা তাহার মনে পড়িল। নেগ্লিজে-পরা একটি মেয়ে বারান্দায় পাতা বেতের চেয়ারে বসিয়া একচোখ টিপিয়া আপন প্রস্ফুটিত বক্ষের প্রতি ভারী একটা মুখরোচক ইশারা করিতেছে। পারীতে নাকি এমন দৃশ্য বিরল নয়, দু'পয়সা খরচ করলে নাকি ইহার চেয়েও অধিক সুড়সুড়ি-দায়ক দৃশ্য দেখা

* পোলদেশের রাজধানী, ইং ওয়ার্‌স।

† Tenor, সঙ্গীতে কণ্ঠস্বরের প্রকার ভেদ।

যায়, এবং আরো দু'পয়সা খরচ করিলে উক্ত মেয়েটির মরালগ্রীবা-বিনিন্দিত হাত দু'খানাও তাহার গলায় অতি মৃদু, অতি মধুরভাবে পরাইয়া দিতে পারে। এবং তারপর আরো দু'পয়সা খরচ করিলে এবং আরো দু'পয়সা··

সহসা পান্না কাতাঝীনার তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বর জামাইয়ের অমন চমৎকার দিবাস্বপ্নটা একেবারে মাটি করিয়া দিল। পান্না কাতাঝীনা নূতন প্রসঙ্গের উত্থাপন করিলেন—

"ভগবানের এমনই সুক্ষ্ম বিচার যে মানুষকে না খাটিয়ে তিনি এক পয়সা দিতে চান্ না। ভাগ্যের ফের, কখনো ওঠে, কখনো নাবে। এই দেখো না লটারীর টাকাগুলো জিৎলুম, একটা-আধটা জলতী নয়, নগদ ২৫,০০০! ভাবলুম, এবার আমার দুঃখু ঘুচলো, জীবনের শেষ কটা বচ্ছর আর হা-পয়সা জো-পয়সা করে' কাটাতে হবে না। টাকাগুলো বাঙ্কে জমা রাখলুম, ভাবলুম, সুদে খাটালে, কী জানি বাপু কে ফাঁকি দেয় না দেয়। বাঙ্কে কম সুদ, তা কমই সই। সেখানে চোর-জোচ্চোরের বালাই নেই। মাসে মাসে সুদ পাই আর কিছু কিছু আসল ভাঙ্গাই, এমনি করে' মাস কয়েক কাটলো। তারপর বছর ঘুরতে না ঘুরতেই এক নতুন গেরো। প্রশেঁ পান্স্ত্ভা, দিনে-দুপুরে পথ চলতে চলতে কলার খোসায় পা দিয়ে পিছলে পড়ে' গিয়ে পাটা ভাঙলুম! ছ'টি মাস হাঁসপাতালে শুয়ে! ডাক্তারেরা বলে অস্তর করতে হবে, হাড়টা নাকি ভেঙে একেবারে দু'টুক্রো হয়ে গেছে। পায়ের মাংস কেটে ভাঙা হাড়টাকে টেনে বার করতে হবে, তারপর হাড়ের টুক্রো দু'টোকে ইস্ক্রুপ দিয়ে জোড়া দিতে হবে, এবং সেই অবস্থায় কড়িকাঠ থেকে দড়ি দিয়ে বেঁধে পাটাকে ঝুলিয়ে রাখতে হবে ছ'টি মাস, যেন মাংসের দোকানে ভেড়ার ঠ্যাং!"

উক্ত উপমায় উপস্থিত সকলেই টেবিলের উপরে সাজানো, নানা

অলঙ্কারে অলঙ্কৃত ও নানা রূপে রূপান্তরিত মাংসের খাবারগুলার প্রতি আপন অজ্ঞাতসারে একবার দৃষ্টিপাত করিল। ছোট মেয়ে হান্‌কার ভিতরটার একটা মোচড় দিয়া উঠিল, সে মা'কে সাহায্য করিবার অছিলায় সেই যে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল তাহার পর তাহাকে আর দেখা গেল না।

পান্না কাতাঝ্যীনা কহিতে লাগিলেন—

"তারপর, প্রশেঁ পান্‌স্ত্‌ভা, ২৫০০০ জ্‌লতীর ১৫০০০ চোখের নিমেষে যেন একেবারে উবে গেল; ডাক্তাররে, ওষুধরে, পথ্যিরে। দু'টি মাস বিছনায় শুয়ে, আর পাটা কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে, যেন সেটা আমার পা'ই নয়! তারপর সেরে উঠে গেলুম হাওয়া বদ্‌লাতে পাহাড়ে, এক সানাতো-রিউমে, আরো পাঁচ হাজার গেল তাতে। তারপর যে ডাক্তার চিকিচ্ছে করে' আমায় সারিয়ে তুললে, ভারী সোঁদর-সুপুরুষ মানুষটো, তাকে একটা সোনার ঘড়ি কিনে উপহার দিলুম, দামী ঘড়ি, তার উল্টো দিকে খোদাই করে' লেখা, 'অসীম কৃতজ্ঞতার পরিচায়ক এই সামান্য স্মৃতিচিহ্ন— উপকৃতা।' তাতেও প্রায় হাজার খানেক জ্‌লতী লাগলো। তারপর পাঁচশ' জ্‌লতী দিলুম গির্জেয়, মানত করেছিলুম যে চেঁস্তোহোভার * মা মারীয়া যদি পা'টা ভালো করে' দেন ত মা'কে পাঁচ শ' জ্‌লতী গুনে দেবো। তারপর অমুক রে তমুক রে, হেন রে তেন রে। বাকী রইল হাতে কয়েক শ' জ্‌লতী। তাতে ত আর সারা জীবন চলবে না। তাই আবার কাজের খোঁজে বেরুলুম। এখন আবার যে কে সেই, গতর খাটিয়ে খাচ্চি।"

পান্না কাতাঝ্যীনা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। টাকাগুলা যে

* পোলদেশের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। চেঁস্তোহোভার মাদন্না পরীক্ষা-পাস, আরোগ্যলাভ প্রভৃতি গুণাবলী-দ্বারা আমাদের কালীঘাটের মা কালীকেও হার মানাইতে পারেন।

অমন ক্ষিপ্রগতিতে খরচ হইয়া গেল তাহা শুনিয়া বড়ছেলে ভীতলদ্ ও জামাই উভয়েই অকারণে এক গভীর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিল। পান্না কান্তাঝীনা এক নূতন প্রসঙ্গের উত্থাপন করিলেন—

"হাঁসপাতালে ছ'টা মাস যে করে' কাটিয়েচি তা ভাবতেও ভয় করে। 'জীবন', 'জীবন,' লোকে কথায় বলে, জীবন যদি কোথাও থাকে ত সে বাড়ীতে নয়, রাস্তাঘাটে নয়, থিয়েটার-সিনেমাতে নয়, সে হাঁসপাতালে! বিছানায় শুয়ে শুয়ে কত জিনিষই দেখলুম যে তা লিখলে একখানা বই হয়ে যায়। পান্ত্ভো ব'ললে বিশ্বেস ক'রবেন না, একবার যে-কাণ্ডটা হ'লো আমি যে-ঘরটায় শুয়েছিলুম ঠিক সেই ঘরটার মাঝ-মধ্যিখানে। আমি যে ঘরটায় শুয়েছিলুম সেটা অস্তর-করা রুগীদের ঘর। রুগীদের চেহারাগুলোর কথা মনে পড়লে যেন গাটা শিউরে ওঠে! কারো সর্বাঙ্গ বেণ্ডেজ-করা, সুধু নাকটা খোলা, কারো বা একটা হাত নেই, কারো বা পা'দুটোর একটাও নেই। সবাই মড়ার মতন পড়ে আচে, সুধু নিঃশ্বেস ফেলার সঙ্গে সঙ্গে গায়ের কম্বলটা একটু একটু কাঁপচে মাত্র। আমার একটু দূরেই একটা রুগী ছিল, বয়েস বেশী হবে না মেয়েমানুষটার, বছর তিরিশ বত্রিশ হবে। তার পায়ে একটা কী অস্তর করা হয়েচে। তার মুখ দেখে মনে হয় না যে তার কোনো অসুখ-বিসুখ করেছে, সুধু শুয়ে থাকে আর বই পড়ে, আর না হয় ঘুমোয়। এখন হয়েচে কী, একদিন মাঝ-রাত্তিরে হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে দেখে, তার অস্তর-করা আঙুলটা দিয়ে টপ্ টপ্ করে' রক্ত পড়ে' বেণ্ডেজটা একেবারে ভিজে উঠেচে। তা কোথায় নার্স্‌কে ডাক্ তা নয়, ব'লবো কী, প্রশেঁ পান্ত্ভা, মাগীটা সটান্ উঠে গিয়ে একটা বাল্তী এনে বিছানার তলায় রেখে আবার পাশ ফিরে শুলো! আমি বলি কী জানি বাপু, হয়তো ডাক্তারে তাই বলেচে। অমন দুম্বো মাগীটার ঘটে অতটুকু

বুদ্ধি নেই, তা আমি জানবো কেমন করে' গা! বলি, হয়তো বদ্‌রক্ত বেরিয়ে যাচ্চে। তারপর, প্রশেঁ পান্‌স্ত্‌ভা, সারারাত টপ্‌, টপ্‌, টপ্‌, টপ্‌, ঠিক ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতন টপ্‌, টপ্‌, টপ্‌, টপ্‌। সারারাত আমি চোখে-পাতায় করতে পারি নে। মানুষটোর পা' দিয়ে রক্ত গড়িয়ে, বিছানা ফুঁড়ে নীচের বাল্‌তীটার ভেতর গিয়ে পড়চে, টপ্‌, টপ্‌, টপ্‌ টপ্‌! ভোর বেলায় যখন নার্স এলো তখন তার শেষ হয়ে গেচে।"

পান্না কাতাঝ্যীনা কিছুক্ষণ চুপ করিলেন, বড় মেয়ে ভান্দা উঠিয়া স্বামীর কানে ফিস্‌-ফিস্‌ করিয়া কী বলিয়া বিদায় না লইয়াই তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল। পান্না কাতাঝ্যীনা পুনরায় সুরু করিলেন—

"হাঁসপাতালে যেসব কাণ্ড ঘটে তা, প্রশেঁ পান্‌স্ত্‌ভা, কোনো নভেল-নাটকেও পড়া যায় না। শোনোই না গো একবার কী-ব্যাপারটা ঘটলো! অবশ্য সে আমাদের ঘরে নয়, মড়ার ঘরটায়।"

মৃত্যু ও মৃতদেহের কথা শুনিয়া জামাই যেন একটু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিল। আজ গত ৬৫ বৎসর ধরিয়া সে মৃত্যুকে ফাঁকি দিয়া আসিয়াছে, মৃত্যুর কথা যখনই মনে হইয়াছে তখনই সে একটা না একটা বৈজ্ঞানিক বা রাজনৈতিক প্রশ্ন লইয়া দিনের পর দিন বই পড়িয়া কাটাইয়াছে। সহসা পান্না কাতাঝ্যীনার বাস্তবিকতাপূর্ণ কী এক মৃত্যুর কাহিনীর ভয় তাহাকে কিছু বিহ্বল করিয়া ফেলিল। কোনো অছিলায় ওঠা যায় কি না তাহা ভাবিবার আগেই পান্না কাতাঝ্যীনা নূতন কাহিনী সুরু করিলেন—

"প্রশেঁ পান্‌স্ত্‌ভা, এ গল্প নয়, একেবারে সত্যি ঘটনা, বাস্তব! আমি যে-হাঁসপাতালটায় ছিলুম, তাতে পুরুষ নার্সও ছিল, মেয়ে নার্স্‌ও ছিল। পুরুষদের ঘরে প্রায়ই পুরুষ নার্স্‌ থাকতো। এখন হয়েছে কী, মড়ার ঘরে সেদিন গোটা দশেক লাশ পড়ে' আছে।

সুড়ঙ্গের মতন ঘরটায় সারি সারি খাট পাতা, আর তার ওপর রুগীগুলো যেমন শুয়ে ছিল, মারা যাওয়ার পরও তেমনি অবস্থাতেই মড়ার ঘরে শুয়ে আচে, সুধু শাদা কাপড় দিয়ে তাদের আপাদমস্তক ঢাকা দেওয়া। মস্ত বড় ঘরখানা, সেখানে দিনের বেলাতেও অন্ধকার থম্-থম্ করে। সারি সারি শাদা কাপড়ে ঢাকা মড়া, সুধু দু'একখানা খাট খালি পড়ে' আচে। এখন, মড়ার ঘরে সারা রাত একজন চৌকিদার থাকে, কেন কী জানি বাপু! তা হয়েচে কী, একদিন রাত্তির বেশ গভীর হয়ে এসেচে, চৌকিদারটা দোরের কাছে বসে' ঝিমোচ্চে। ঘরের এককোণে মিট্-মিট্ করে' সুধু একটা আলো জ্বলচে। হঠাৎ চৌকিদারটা চোখ চেয়ে দেখে, একটা মড়া যেন একটু নড়ে' উঠলো। ভাবলে, হয়তো তার চোখের ভুল। দু'চার বার পায়চারী করে' আবার তার চেয়ারটাতে এসে বসলো। কিছুক্ষণ পরে দেখে ওমা, মড়াটা দিব্যি পাশ ফিরে শুলো। সর্বনাশ! ভয়ে তার প্রাণ একেবারে শুকিয়ে উঠেচে। ভাবলে, পালাবে কি পালাবে না। কাঠখোট্টা গোঁয়ার-গোবিন্দ গোছের লোকটা, তা না হ'লে কি তাকে মড়ার ঘরে চৌকি দিতে দিয়েচে? ভাবলে, না পালাবে না, ও ভূত-পেরেত কিচ্ছু নয়, হয়তো একটা মড়া বেঁচে উঠেচে। এমনও ত হয় গো বাছা! তা, সাহস করে' এগিয়ে গিয়ে মড়াটার খাটের কাছে দাঁড়িয়ে ভাবচে, কী করবে? দেখে, মড়াটার নিশ্বেসে তার মুখের কাপড়টা থেকে থেকে কেঁপে উঠচে। বলে, দেখিই না ব্যাপারটা কী! বলে' তার মুখের ওপর থেকে কাপড়টা খুলে ফেললে। দেখে—"

পান্না কাতাঝ্যীনা পাকা গল্প-লেখকদের মত গল্পের শেষের দিকে হঠাৎ থামিয়া গেলেন।

পানী য়ানীনার পোষ্যপুত্র (জিজ্ঞাসা-চিহ্ন) পান্ তাদেউশ্ অধীরভাবে জিজ্ঞাসা করিল, "কী দেখলে" ?

পান্না কাতাঝ্যীনা গম্ভীর, কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—

“দেখে, একটা পুরুষ নার্স্ কাজে ফাঁকি দেবার মৎলবে মড়ার ঘরে এসে মড়াদের পাশাপাশি মুখে ঢাকা দিয়ে শুয়ে পড়েচে। জলজ্যান্ত মানুষটা দশটা লাশের মাঝ-মধ্যিখানে শুয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্চে!”

জামাই একটু ইতস্ততঃ করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল, বলিল, “ভান্দেচ্কার শরীরটা তেমন ভালো নেই। সে বাড়ী চলে' গেচে, দেখি গিয়ে সে কেমন আচে। মাপ্ করবেন, ভান্দচ্কা যদি ভালো থাকে ত তাকে নিয়ে আবার আসবো এক্ষুনি।” বলিয়া সে পান্না কাতাঝ্যীনার হস্তচুম্বন করিয়া যৌবন-পরিপূর্ণ পদবিক্ষেপে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

বড়ছেলে পান্ ভীতল্দ্ অধীরভাবে ঘড়ির দিকে তাকাইয়া তাহার চেয়ারটার উপর মনে মনে কাটা পাঁঠার মত ছট্ফট্ করিতে লাগিল। এতক্ষণে তাহার ইয়ার স্তানিস্লাভের ঘরে নিশ্চয়ই অন্যান্য ইয়ারবৃন্দ আসিয়া হাজির হইয়াছে। স্তানিস্লাভ্ বোধ করি এইবার তাহার নিজের হাতে তৈরী-করা ভিশ্ন্যুফ্কার * বোতলটা টেবিলের মাঝখানে রাখিল। তাহার পাশে আনারসের ভদ্কাটাও নিশ্চয় ভোলে নাই, এবং কমলালেবুর ভদ্কাটাও কি বাদ গিয়াছে? টেবিলের উপর মস্ত চেটালো থালায় সাজানো কাভিয়ারের স্যাণ্ডুউইচ্, তাহার পাশেই শ্লেজ্-মাছের দাগাগুলা অলিভের তেলে ভাসিতেছে। তাহার চারিপাশে মিহি করিয়া কাটা পেঁয়াজ। পান্ ভীতল্দ্ মানসচক্ষে দেখিতে লাগিল, সে নিজে একটুকরা কালো রুটির উপর কাভিয়ার মাখাইয়া মুখে পূরিয়া দিল, এবং অনতিবিলম্বে গেলাস ভরিয়া খানিকটা ভিশ্ন্যুফ্কা গলার ভিতর ঢালিয়া দিল। কড়া ভদ্কা তাহার কণ্ঠ ও পাকস্থলী বাহিয়া ধীরে ধীরে নীচে নামিয়া চলিল।

* চেরী-ভদ্কা।

পান্ ভীতল্দ্ কল্পনার চক্ষে উক্ত পেয়টির উষ্ণ প্রতিক্রিয়া অনুভব করিতেছে এমন সময়ে পান্না কাতাঝ্যীনা এক নূতন গল্প আরম্ভ করিলেন—

"প্রশেঁ পান্স্তভা, আর একবার যে কেলেঙ্কারীটা হ'লো সে কথা নিশ্চয়ই খবরের-কাগজওলারা ছাপিয়েচে, পান্স্ত্ভো হয়তো পড়ে' থাকবেন। সেও আমি হাঁসপাতালে থাকবার সময়। পান্স্ত্ভো জানেন যে হাঁসপাতালে ছাত্রদের দেখাবার জন্যে মরা মানুষের হাত, পা, পিলে, লিবার, ফুস্ফুস্ এইসব কড়া ইস্পিরিটে জরিয়ে রাখা হয়। মা গো, ভাবতে গেলেও গা'টা ঘিন্-ঘিন্ করে' ওঠে! প্রকাণ্ড একটা কাঁচের চৌবাচ্চায় এক চৌবাচ্চা ইস্পিরিট্, আর তার মধ্যে পিলে, লিবার ফুস্ফুস্গুলো যেন কচ্ছপের মতন ভেসে বেড়াচ্চে। ছাত্রদের যার যখন যেটা দরকার হয়, সেই চৌবাচ্চায় হাত ডুবিয়ে সেটা টেনে তোলে, আবার কাজ হয়ে গেলে চৌবাচ্চার ইস্পিরিটের ভেতর ফেলে দেয়। ভারী কড়া ইস্পিরিট, তাতে মাংসগুলো চট্ করে' পচতে পারে না। এখন হয়েচে কী, হঠাৎ দেখা গেল যে চৌবাচ্চার পিলে, লিবার, ফুস্ফুস্গুলো দু'দিন যেতে না যেতেই পচতে সুরু করচে। কী ব্যাপার, কী ব্যাপার! নিশ্চয়ই ইস্পিরিটে কোন দোষ আচে। তারপর ইস্পিরিট খানিকটে নিয়ে পরীক্ষে করে' দেখলে হাঁসপাতালে, দেখে তার বেশীর ভাগই জল! কী ব্যাপার, ইস্পিরিটে জল কোত্থেকে এল, এই নিয়ে নানা তদন্ত সুরু হ'লো। শেষকালে জানা গেল যা তা ভাবলেও গা শিউরে ওঠে।"

সবাই একসঙ্গে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, "তাইত ইস্পিরিটে আবার জল কোত্থেকে আসবে? বোধ হয়, দোকানে ভেজাল স্পিরিট বেচেছে।"

পান্না কাতাঝ্যীনা কহিলেন—

"উঁহু, সে এক অদ্ভুত কাণ্ড! পান্স্ত্ভো ব'ললে বিশ্বেস করবেন না,

হাঁসপাতালের কতকগুলো চাকরে মিলে সেই চৌবাচ্চা থেকে গেলাস ভরে' ভরে' ইস্পিরিট তুলে নিয়ে ভূদ্‌কা তৈরী করে' গিলেচে, আর তার বদলে দেদার জল ঢেলেচে চৌবাচ্চায় !"

পান্ ভীতল্‌দ্ পান্না কাতাঝ্যীনার হস্তচুম্বন করিতে করিতে বলিল, "আমায় এক্ষুণি যেতে হ'লো, মাপ করবেন। আমার এক বন্ধুর নামও স্তানিস্লাভ, সেখানেও ইমিয়েনীন্স্রী, না গেলে রাগ ক'রতে পারে।" বলিয়া সে একপ্রকার ছুটিয়াই ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

পান্না কাতাঝ্যীনা কী একটা নূতন কাহিনী সুরু করিলেন। পানী স্নানীনা ও তাঁহার পোষ্যপুত্র (জিজ্ঞাসা-চিহ্ন) উভয়েই টেবিলের উপর খাবারগুলার দিকে পিঠ দিয়া বসিয়া সেই গল্প শুনিতে শুনিতে কোনো-প্রকারে আত্মসম্বরণ করিয়া রহিলেন। পানী স্তানিস্লাভা এতক্ষণ ধরিয়া তাঁহার "পাক-প্রণালীর" উপদেশ অনুসারে কী একটা নূতন রকমের মাংসের পিঠা তাঁহার নূতন ইলেক্‌ট্রিকের উনানটাতে প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত ছিলেন। খাবারের থালা হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিয়া তিনি অবাক্ হইয়া গেলেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "ছেলেমেয়েগুলো আবার গেলো কোথায় ?"

পান্না কাতাঝ্যীনা স্থিরভাবে উত্তর করিলেন, "কেন, যে-যার বাড়ী চলে' গেচে। পানীর সঙ্গে দেখা করে' যায় নি ? আমায় বললে, 'এবার আসি তা'হলে', আর আমিও এমন ভোলা মানুষ যে একবার খেয়ে যেতেও বললুম না। তা পানী স্তানিস্লাভো, আমিও এবার উঠি, রাত হয়েচে অনেক বোধ হয়।"

পানী স্তানিস্লাভা বাধা দিয়া বলিলেন, "ওমা সে কি কথা গো, পান্নো কাতাঝ্যীনো ! কিছু খেলে না দেলে না এর মধ্যেই উঠচো যে ! না না, তাও কী হয়, কিছু খেয়ে যেতে হবে বৈকি !"

পান্না কাতাঝ্যীনা অতিশয় ক্ষোভের স্বরে কহিলেন, "পানী স্তানিস্লাভো, খেতে কি আমার অসাধ গো, কিন্তু খাবে কে? ডাক্তারে খাওয়া একেবারে প্রায় বারণই করে' দিয়েচে, বলে, আমার শরীরে যতগুলো পাথুরী আচে তা দিয়ে নাকি একখানা বাড়ী গাঁথা যায়! আজ বাদে কাল আবার একটা অস্তর করাতে হবে। আর খাওয়াও আজকাল যা হয়েচে তা বিষ ব'ললেই হয়। এত বড় বড় হোটেল-রেস্তোরাঁ চলচে, বড় বড় বাড়ী, ফ্যাশানের আসবাব্, চাকরবাকর্, আর খাবার একেবারে বিষ, খাঁটি বিষ!" বলিতে বলিতে পান্না কাতাঝ্যীনা প্রবেশকক্ষে আসিয়া তাঁহার পুরুষালী ধরণের পাল্তো'টা * পরিতে রত হইলেন। পরে কহিতে লাগিলেন, "আমি হোটেল কিম্বা রেস্তোরাঁর ধার দিয়েও যাই নে পানী স্তানিস্লাভো। হয় নিজে রেঁধে খাই, আর না হয় কারো, জানা-শোনা লোকের বাড়ীতে, তাও কি কিছু খাবার জো আচে? এক টুক্রো রুটি, একটু মাখন, একবাটি চা, ব্যস্! তাও আবার ঘড়ি ধরে! আজকালকার হোটেল-রেস্তোরাঁগুলোও যা হয়েচে, যত সব রোগের এক একটি ঘাঁটি! এই কিছুদিন আগে কাগজে পড়েন নি, একটা নামজাদা হোটেলে কী কেলেঙ্কারীটা হ'লো! তা বলি শুনুন, পানী-স্তানিস্লাভো।"

সদর দরজাটা খুলিয়া, চৌকাঠের উপর দাঁড়াইয়া পান্না কাতাঝ্যীনা আর এক নূতন গল্প ফাঁদিয়া বসিলেন—

"মস্ত হোটেলটা গো, কাগজে তার নাম দেয় নি, মোটা ঘুষ খেয়েচে নিশ্চই। যাই হোক, সেই হোটেলে যারা যারা খেতে যেত তাদের অনেকেরই গায়ে হঠাৎ একটা বিদঘুটে রকমের রোগ দেখা দিলে,

* ওভারকোট।

কতকটা কুটের মতন। ডাক্তারেরা পরীক্ষে করে' দেখলে, সে রোগের বীজ কেমন করে' খাবারের সঙ্গে শরীরে ঢুকেচে। তাই নিয়ে হোটেলের খাবার সম্বন্ধে তদন্ত সুরু হ'লো। অনেক খোঁজাখুঁজির পর জানা গেল ব্যাপারটা এই: কী একটা গরম দেশের একটা বিদ্‌ঘুটে রোগেব বীজ নিয়ে এখানকার একটা হাঁসপাতালে কয়েকজন ডাক্তার কতকগুলো খরগোশের ওপর পরীক্ষে করছিল, রোগটার একটা ওষুধ বের করতে পারলে নাকি ওলন্দাজ সরকারের কাছ থেকে অনেক টাকা পুরস্কার পাওয়া যাবে। সে যাই হোক্, এখন হয়েচে কী—সেই হাঁসপাতালের একটা চাকর খরগোশ-গুলো ফেলে না দিয়ে সটান্ সেই হোটেলে এসে বেচে দিয়ে যেত। সস্তার খরগোশ হোটেলওলাও দেদার কিনে খদ্দেরদের পাতে দিতে লাগলো। দেখ দিকি একবার লোকটার কাণ্ড! রুগ্ন খরগোশগুলো মানুষকে খাওয়ানো! তাই বলি পানী স্তানিস্লাভো, পানী এত কষ্ট করে' খাবার-দাবারগুলো তৈরী করলেন, আর ছেলেমেয়েরা কেউ তা মুখে পর্যন্ত দিলে না! আজকালকার ছেলেমেয়ে, তাদের যত সব ফ্যাশানের হোটেল-রেস্তোরাঁ ছাড়া আর কিছু ভালো লাগে না। পয়সা দিয়ে কেবল বিষ কিনে খাওয়া। আচ্ছা, আসি তা'হলে আমি এইবার পানী স্তানিস্লাভো, আজ সন্ধ্যেটা পানীর বাড়ীতে বেশ কাটলো। আসবেন একদিন আমার ওখানে যদি সময় পান্, আমি বিকেলের দিকে প্রায়ই বাড়ী থাকি। আচ্ছা, আসি তাহ'লে।" বলিয়া পান্না কাতাঝ্যীনা বাহির হইতে ঝনাৎ করিয়া সদর দরজাটা বন্ধ করিয়া দিলেন। দরজার ওদিক হইতে তাঁহার স্বগত কথোপকথন বহুক্ষণ পর্যন্ত শোনা গেল—"এই দেখো না, সিঁড়ির আলোটা আবার নিবে গেচে! সুইচ্‌টা কোথায় কে জানে, হ্যাঁ এই যে, এইবার আলোটা জ্বালা গেল, আবার নিবে না যায়। আজকালকার যতসব কলকারখানা, আলোটাও আবার

আপনা-আপনি নিবে যায়। যাক্ রাস্তার আলো দেখা যাচ্চে, ওমা, আবার বৃষ্টি পড়চে যে গো, পোড়া কপাল আমার, ছাতাটাও আনতে ভুলে গেচি—” ইত্যাদি ইত্যাদি।

পানী স্তানিস্লাভা ঘরে ঢুকিয়া দেখিলেন, টেবিলের উপর অত যত্নে সাজানো খাবারগুলা কেহ স্পর্শ পর্যন্ত করে নাই। পানী য়ানীনা দিভানটার উপর আধো-শোয়া অবস্থায় ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন, এবং তাঁহার পোষ্যপুত্র (জিজ্ঞাসা-চিহ্ন) একটা চেয়ারে বসিয়া আর একটা চেয়ারের পিঠের উপর মাথা রাখিয়া অসাড়ে নিদ্রা যাইতেছে। কাহাকেও না জাগাইয়া, পানী স্তানিস্লাভা পা টিপিয়া আপন ঘরে আসিয়া আলোটা নিবাইয়া বিছানায় শুইয়া পড়িলেন। নিত্যকার অভ্যাস মত নিদ্রার পূর্বে তাঁহার পুত্রকন্যাদের কল্যাণে প্রার্থনা করিবার কথাটা পর্যন্ত আজ তাঁহার মনে রহিল না।

ভারশৌ,
২৫শে মে, ১৯৩৮।

মাদন্না

ইউরোপের পেট্রোল-চালিত লৌহ-সভ্যতা যখন পাথর-বাঁধা পৃথিবীর বুকের উপর হাতুড়ী পিটিতে পিটিতে ক্ষেপার মত ছুটিয়া বেড়ায়, তখন পিঠের কালো চুলের বেণী খেলাইয়া, নানারঙের ঘাঘ্‌রার ঢেউ তুলিয়া দলে দলে বেদেনী, দেমাক্-ভরা পা ফেলিয়া নৃত্যের তালে দেহ দুলাইয়া পথ চলে ক্রোশের পর ক্রোশ।

গ্রীষ্মের এক স্বেদ-সিক্ত মধ্যাহ্নে ভারশৌএর একখানা আফিস-মুখো ট্রামে এক নগ্নদেহ শিশুকে কোলে লইয়া যুবতী বেদেনী আসিয়া উঠিল। পরনে সবুজ জমীর উপর লাল ফুল আঁকা ঘাঘ্‌রা, হলুদ রঙের কাঁচুলী, মাথায় একখানা লাল টক্‌টকে রুমাল কাকপক্ষের মত কালো চুলের রাশি আলগোছে ধরিয়া রাখিয়াছে। দুইখানা নগ্নহাতের উষ্ণ স্নেহে শিশুকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া সে একপাশে দাঁড়াইল। তাহার বয়স বছর কুড়ি হইবে, শরীরের প্রতি অঙ্গে যৌবন উছলিয়া পড়িতেছে। পুরু ঠোঁটের কুটিল রেখা গালের উপর হাসির ঘূর্ণির মত টোল দুইটার সঙ্গে মিশিয়াছে।

টানা ভুরুর কোলে চোখ দুইটা যেন কালো আগুন। শিশুর কচি আঙ্গুলগুলা চুম্বন করিয়া বেদেনী যেন তাহার মুখের উপর আঁকা কত কী গুপ্ত সৌন্দর্য দুই চোখ ভরিয়া দেখিতে লাগিল।

কালো আফিসী পোষাক পরা, ছড়ি ও দস্তানা হাতে উচ্চপদস্থ ভদ্রলোকটি একটু সরিয়া দাঁড়াইলেন। বেদেনীর আব্রুবিহীন অস্তিত্বটা তাঁহাকে একটু বিব্রত করিয়া তুলিল। খালি পায়ে পথ চলিলে অনভ্যস্ত মানুষের গা'টা যেমন সির্-সির্ করিয়া উঠে, তাঁহার সর্বশরীরে ঐরকম একটা অনুভূতি মাকড়সার মত হাঁটিয়া বেড়াইতে লাগিল। হাতের পুরাণো ইংরেজী টাইম্‌স্‌খানা খুলিয়া তিনি তাহাতে মনোনিবেশ করিলেন।

বছর তিনেকের একটি ছোট ছেলে বেদেনীর দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া ফিস্-ফিস্ করিয়া তাহার মা'র কানে-কানে বলিল—"দেখ্‌চো মা, খোকাটা একবারে নেংটা!" তাহার হাতের উপর মৃদু আঘাত করিয়া মা বলিলেন —"দুষ্টু ছেলে, অসভ্য ছেলে, ওদিকে তোর তাকাতে হবে না—ঐ দেখ্ দেখ্‌চিস্, ঐ মস্ত কালো ঘোড়াটা, ইস্ ওর গায়ে কী ভীষণ জোর, ঐ প্রকাণ্ড মালগাড়ীখানাকে টেনে নিয়ে চলেচে! আর ঐ দেখ্ কী সুন্দর কুকুরটা, দেখ্‌চিস্।" মার কথায় কান না দিয়া ছেলেটি জিজ্ঞাসা করিল— "অতবড় পানী,* ওর পায়ে জুতা নেই কেন মা?" চোখ রাঙাইয়া মা তাহাকে ট্রামের জানালা দিয়া পথের নানা বিচিত্র দ্রব্য-সামগ্রী দেখাইতে লাগিলেন—"দেখ্‌চিস্ ঐ লোকটা কতগুলো ফানুস্ নিয়ে চলেচে? কিনে দেবোখন একটা—কী সুন্দর মটর-গাড়ীটা গো! আচ্ছা, আমরা যখন মটর কিনবো তখন কী রঙের মটর কেনা যাবে বল্‌তো।"

* "মহিলা"।

উত্তরে কিছুক্ষণ ভাবিয়া ছেলেটি বলিল—"বেগুনী রঙের"। কিন্তু তাহার মনের চারিপাশে অতবড় পানীর পায়ে জুতা নাই কেন, এবং খোকাটা নেংটা কেন, এই দুইটা প্রশ্ন ঘুরিয়া ফিরিয়া পায়চারী করিতে লাগিল।

বেদেনীর ঐ লজ্জা-সরমহীন ব্যবহার লইয়া দুইটা চাষী বুড়ী আপোষে আলোচনা সুরু করিল—"হ্যাঃ, বেদেমাগীদের আবার নজ্জাসরম! দু'টো পা' দু'টো হাত থাক্‌লেই কি আর মানুষ বলে মা! জংলী, জংলী মানুষ ওগুনো, ওদের আবার নজ্জা-মান, সভ্যতা-ভব্যতা! কাতলিক্ হ'লেও বা কতা ছেলো! ভগমান্ জানেন আগুন জ্বেলে, নেচে কুঁদে ওদের কী ঢঙের পূজো-আচ্ছে! ওদের দেব্‌তা আবার দেব্‌তা!—শয়তান্! দেকোনা একবার ছুঁড়ীটের কাণ্ড, নিজের ত ঐ বেশ তা'র ওপর আবার ঐ উলঙ্গ ছেলেটারে নে' নোকসমাজে বেরুনো! দেকোই না ছেলেটা আবার কা'র গায়ে কী না করে' দেয়! ছি ছি ছি! ঐ জংলী মানুষ-গুনোরে গাড়ীতে ঘোঁড়াতে উট্‌তেই বা দেওয়া কেন বাপু! যত সব বিদিশী মান্‌ষে আমাদের সব্বনাশ ক'রলে! এক ইহুদীতে রক্ষে নেই তা'র ওপর আবার বেদে! ঐ বেদেনী ছুঁড়ীদের রূপের ছিরি দেকেই আমাদের মিন্সেগুনোর যেন চোক ঠিগ্‌রে পড়ে গো! ব'ল্‌তে নজ্জায় মরি মা, আমার কর্তার যখন বয়েস ছেলো, তখন ঐ ওদেরই এক বেদেনী ছুঁড়ীকে নে' কী ঢলাঢলিটাই ক'রলে! বলে, ওদের সঙ্গে বেইরে যাবো! বলে, ওরা যাদু জানে, আমি সেই যাদু শিক্‌বো! দেকো দিকি কাতলিকের কতার ছিরি, যীশুখৃষ্টের কাতলিক ধম্ম ছেড়ে উনি ওদের ধম্ম নেবেন! বেদেনীরা যাদু না জান্‌লে কি আর অমন মদ্দ মিন্সেটারে বশ ক'ত্তে পারে! এক ইহুদীর জ্বালায় রক্ষে নেই, তা'র ওপর আবার বেদে!"

ইহুদীর নাম শুনিয়া এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক, পোষ্ট-আফিসের কেরাণীর মত চেহারা, কপালে চশ্‌মা তুলিয়া সাম্‌নের অপর এক বৃদ্ধকে লক্ষ্য করিয়া

বলিতে লাগিলেন—“ইহুদীগুলোই ত, প্রশেঁ পানা, * জগতের সর্ব্বনাশ করলে! হিট্‌লারকে লোকে মন্দ বলে, কিন্তু প্রশেঁ পানা, জগতের শিরদাঁড়াটার ওপর ইহুদীরূপ যে পাকা ফোড়াটা, তার ওপর অস্তর যদি করে' থাকে কেউ ত সে ঐ পান্ হিট্‌লার! ইউরোপ সভ্যদেশ, সেখানে অসভ্য মানুষের জায়গা নেই। আমরা, পানিয়ে, ভারী নরম মানুষ। দেখুন না, ঐ বেদেছুঁড়ীটা ঐ উলঙ্গ ছেলেটাকে নিয়ে ট্রামগাড়ীর একেবারে মাঝমধ্যিখানে দাঁড়িয়ে! ভেবে দেখুন ত এরকম দৃশ্য কি কল্পনা করা যায় বার্লিনে, পারীতে, লণ্ডনে, নিউইয়র্কে! দেবে ফাটকে পূরে, সাতদিনের জেল!” বলিতে বলিতে বৃদ্ধ খানিকটা কাশিয়া জানালা দিয়া মহা আড়ম্বরে মুখামৃত ত্যাগ করিলেন, পরে বলিতে লাগিলেন—“বেদেগুলো, পানিয়ে, চোরের একশেষ! বাগানের ফল, ক্ষেতের সব্জী এই সন্ধ্যেবেলা গুণে গেঁতে গেলে, পরের দিন সকালে প্রশেঁ পানা, তার অর্দ্ধেকও নেই! নতুন আন্‌কোরা পোষাকটা, পানিয়ে, পেট্রোল দিয়ে পরিষ্কার করে' বারান্দায় শুকোতে দিয়ে একটু পেছন ফিরেচো, কি পোষাকটা নেই! প্রশেঁ পানা, আমি থাকি গ্রামে, বেদের উপদ্রব যে কী তা আমার জান্‌তে বাকী নেই। ঐ নেংটো ছেলেটা, পানিয়ে, একটু বড় হয়ে কথা ব'লতে শেখ্‌বার আগেই চুরী ক'রতে শিখ্‌বে! চুরীবিদ্যে, পানিয়ে, ওদের রক্তে! ভারশৌতে আমার এক জ্ঞাতি থাকে, পানিয়ে, জোয়ান মানুষটা, লেখাপড়া জানা, অনেকগুলো বিদেশী পাশ-করা, লণ্ডনে ছিল পূরো একটি বছর! প্রশেঁ পানা, এখানে সে থাকে বড় মানুষদের পাড়ায়, চমৎকার আপার্তামেন্ত্-এ, কলঘরের মেঝেটা পর্য্যন্ত

* পোল ভাষায় “প্রশেঁ পানা” (পুং) “প্রশেঁ পানী” (স্ত্রী) বা “পানিয়ে” (পুং) আমাদের ভাষায় “মশাই” শব্দের মত কথার যেখানে-সেখানে অজস্র পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

শ্বেতপাথরে বাঁধানো, কলে গরম জল, খাসা আপার্তামেন্ত্, পানিয়ে। একদিন, প্রশে পানা, একটা বেদেনী পথ দিয়ে হেঁকে যাচ্ছে, 'কে হাত গোণাবে, কে হাত গোণাবে!' তা সে বলে, দেখিই না বেদেনীর কতবড় বিদ্যে! বলে' পানিয়ে, খেলার ছলে বেদেনীটাকে ডেকে হাত গোণাতে দিলে। বেদেনীটা বলে, 'আমার মুখের দিকে তাকাও'। তার খানিক পরে ঐ অতগুলো পাশ-করা মানুষটা, পানিয়ে, ব্যাগ খুলে পয়সাকড়ি যা ছিল সব ঐ বেদেনীটার হাতে! বলে, 'কী ব্যাপারটা হ'চ্চে কিছুই বুঝতে পারচি না, সুধু মনে আচে যে ব্যাগ খুলে বেদেনীর হাতে টাকাকড়ি যা' ছিল সব দিয়ে দিলুম!' দেখুন দেখি চোর মাগীটার কাণ্ড! বেদেনী চলে' যাবার অনেকক্ষণ পরে তার হুঁস হ'লো। হুঁস হয়ে দেখে তা'র সোনার ঘড়িটা নেই! পুলিশ ডাকো, খোঁজো বেদেনীকে, আর খোঁজো! সোনার ঘড়িটা আর নগদ চল্লিশ্‌টা জল্‌তী, * দু'দু'খানা কুড়ি জল্‌তীর নোট, পানিয়ে।"

বেদেনী শিশুকে হাসাইবার জন্য তার চিবুক নাড়িয়া, তাহার নিজের ভাষায় কত কী আদরের কথা বলিল, কতপ্রকার মুখভঙ্গী করিল, পরে চোখ ঠারিয়া তাহার ঐ জীবন্ত পুতুলটার কানে কানে কী বলিয়া হাসিয়া উঠিল। ঐ ক্ষুদ্র শিশুটা যেন তাহার প্রেমিক, তাহার সঙ্গে কত ঠাট্টা-তামাসা, কত রঙ্গরস, কত প্রেমালাপ চলিতে লাগিল। সে যে তাহার ছেলে, তাহাকে সে যে গর্ভে ধরিয়াছে, তাহার শরীরের রক্ত দিয়া সে যে গড়া, সে যে তাহার নিজের, সম্পূর্ণ আপনার! বেদেনী আবার শিশুকে বুকের উপর চাপিয়া ধরিল।

দুইটা উঁচু ক্লাসের ইস্কুলের ছাত্র, ফিস্‌-ফিস্‌ করিয়া বেদেনীর রূপ

* ২ জলতী—১৲ টাকা।

প্রভৃতির আলোচনা করিতে লাগিল। চাপা গলায় ইস্কুলী ভাষা কাহারো বুঝিবার সাধ্য নাই। খিল্-খিল্ করিয়া হাসিয়া একজন অপরের পিঠে চাপড় মারিয়া বলিল,—"যাঃ মাইরী, তুই একেবারে উচ্ছন্ন গেচিস্!"

বেদেনীর শিশু হাসি ছাড়িয়া কান্না সুরু করিল। বেদেনী তাহাকে কত বোঝাইল, কত কথা বলিয়া ভোলাইবার চেষ্টা করিল। শিশুর কান্না থামিল না। তখন বেদেনী তাহার হলুদরঙের কাঁচুলী তুলিয়া তাহার ফুটন্ত স্তনের একটা শিশুর বুভুক্ষু মুখে পূরিয়া দিয়া তাহার কপালে চুমা খাইল, এবং পরে সেই অবস্থায় ভিড় ঠেলিয়া, ঘাঘ্‌রা নাচাইয়া, দেমাক্-ভরা পা ফেলিয়া ট্রাম হইতে নামিয়া গেল।

ইস্কুলের ছাত্র দুইটি ট্রাম হইতে মুখ বাড়াইয়া হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল—এক বৃদ্ধ অপর বৃদ্ধের প্রতি চোখ ঠারিয়া কী একটা ইশারা করিল—চাষী বুড়ী দুইটা বেদেনীর ছেনালী ও বেহায়াপনায় একমত হইল—এবং ছোট ছেলেটি বায়না ধরিল—"মা, আমার ক্ষিদে পেয়েচে, চকোলেট্ কিনে দাও।"

ভারশৌ,

৭ই জুন, ১৯৩৮

কারি-পাউডার

একদা এক শীতের প্রভাতে ভারশৌ সহরে যখন ঘটা করিয়া তুষার নামিয়াছে, তখন সদ্য ফ্লু'র আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিয়া শ্রীমান্ সমীর রায় দিভান্-খাটের উপর পালকের লেপে সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া, চক্ষু মুদিয়া দেশপ্রেমে মজিয়া আছে। সঙ্কীর্তনের আবেশের মত চেতনা ও অবচেতনার মাঝামাঝি মধুর তন্দ্রা তাহার মনকে মুঠা করিয়া ধরিয়াছে। খোলা জানালার কাছে আলো রাখিবার বাহারে টেবিলটার উপর কড়া কাফি জমিয়া প্রায় বরফ হইয়া উঠিয়াছে। প্রবাসী সমীরের সূক্ষ্মদেহ তখন আমাদের এই বঙ্গদেশের একখানা ঝুল-পড়া, গোবর-লেপা, ওড়িয়া ঠাকুরের গামছা-টাঙানো রান্নাঘরে টুল পাতিয়া বসিয়াছে। যেন যাদু-কাঠির সংস্পর্শে এক-এক নিমেষেই এক-এক কড়া তরকারি নামিয়া মেঝের উপর পদ্ম-কাটা কাঁসি ভর্ত্তী হইতেছে: উচ্ছের সুক্তানী, পালম শাকের ঘণ্ট, বড়ি-ছেঁচ্‌কি, লাউ-চিঙ্‌ড়ী, এঁচড়ের ডাল্‌না, বাঁধা কোপির দোর্মা, কুমড়ার ছক্কা, পোনা মাছের কালিয়া, মুড়োর দাল, মাংসের ঝোল, ছানার পোলাও ইত্যাদি ইত্যাদি।

লন্দনে থাকিবার সময় ইহার সমস্তগুলির দর্শন না পাইলেও, আলাদা আলাদা মস্‌লা কিনিয়া দু'একটা গৃহস্থ-পোষা তরকারি বেশ ভালো করিয়াই রাঁধা যাইত। অন্ততঃ মুড়োর ঘণ্ট, আলুর দম, বা মুলো, আলুর খোসা, স্পিনেচ্‌, বেগুন, বরবটি, কচি পেঁয়াজ এবং "প্রণের" বাচ্চা দিয়া, আর তাহাতে বহুদিনের পুরাণো ছাতা-পড়া একটু জলপাইয়ের তেল দিয়া একটা চচ্চড়ি, এবং মটর বা মুসুরীর দাল রাঁধিতে ভাবিতে হইত না, বা টিউব ভাড়া দিয়া পিকাদিল্লীতে বার্কারের দোকান পর্যন্ত ধাওয়া করিতে হইত না। ঐ গলির বাঁকে গ্রোসারের দোকানটাতেই টিনভরা কারি-পাউডার পাওয়া যাইত, ম্যালে কারি, বেঙ্গল কারি, ম্যাড্রাস্‌ কারি, ছোট চার আউন্সের টিন, বড় এক পাউণ্ডের টিন। সরিষার তেল হাতের কাছে না পাওয়া যাইলেও অলিভ্‌ অয়েলের অভাব ছিল না।

ভারশৌএ আসিয়া সমীর ঠিকানার বই খুলিয়া প্রত্যেকটি মুদী বা বেনের দোকানে খোঁজ লইয়াছে, কিন্তু কারি-পাউডার বা তদ্বিধ কোনো মসল্লার তল্লাস পায় নাই। অবশেষে পরিচিত এক উদ্ভিদ্‌-শাস্ত্রজ্ঞ অধ্যাপকের সাহায্যে বিশ্ববিদ্যালয় ও সাধারণ গ্রন্থাগারের মোটা মোটা বই ঘাঁটিয়া সে একবার হলুদের সন্ধান পায় ভারশৌএর সব চেয়ে বড় ডাক্তারখানায়। চক্‌চকে, ঝক্‌ঝকে আল্‌মারীর ভিতর সুন্দর গলা-টেপা শিশিতে সুপারী-কুচীর মত ছোট ছোট টুক্‌রা করিয়া কাটা হলুদ ; শিশির উপর বাহার করিয়া লেখা Curcuma longa, ভেষজটির প্রতি লেখকের ভীতি ও ভক্তির সাক্ষ্য দেয়। পরিষ্কার কাগজের ছোট্ট খামের ভিতর অতি সন্তর্পণে ঢালিয়া দিল, কম্পাউণ্ডার-মেয়েটি, আধ আউন্স। সমীর কৃত্রিম বাল-সুলভ সরলতা, প্রতিভা-উদ্দীপ্ত প্রেক্ষণ, মজার মজার গল্প বলিয়া হাসানো, প্রভৃতি পুরুষের করগত স্ত্রীজাতিকে বশ করিবার মহা মহা ব্রহ্মাস্ত্রগুলি প্রয়োগ করিয়াও মেয়েটির মন গলাইতে পারে নাই।

গম্ভীরভাবে আধ আউন্স হলুদসহ কাগজের মোড়কটি সমীরের সাম্‌নে ধরিয়া দিয়া, দু'একবার গলা সাফ্ করিয়া লইয়া, লজ্জায় অধোবদন হইয়া বলিয়াছিল—"ছেলেপুলেদের ক্রিমিরোগ ঐটুকুতেই সেরে যাবে। দয়া করে' আস্‌ছে বারে ডাক্তারের প্রেসক্রিপ্‌শন্ নিয়ে আস্‌বেন।"

আধ আউন্স হলুদের সঙ্গে খানিকটা লঙ্কার গুঁড়া ও রাই সরিষা পিষিয়া দিয়া সমীর যে মাংস রাঁধিয়াছিল, তাহা খাইয়া তাহার ওদেশী বন্ধু-বান্ধবীরা বলিয়াছিল, এরূপ প্রথম শ্রেণীর হাঙ্গারীয় গুলাশ্ তাহারা জীবনে আস্বাদন করে নাই।

দিনটা যে-ভাবের সে-রকম দিন বাংলাদেশে হইলে ঠাকুরকে ছুটি দিয়া বঙ্গবধূগণ ফুল-কোপি বা ডিমের ভুনি-খিচুড়ী রাঁধিতে পাকগৃহে আবির্ভূতা হইতেন। সুতরাং সদ্য রোগ-মুক্ত, প্রবাসী সমীরের মন যে সহসা দেশ-প্রেমে মজিবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কী? বাটনা-বিরহাতুর সমীর কাগজকলম লইয়া লন্দনের এক ভারতীয় বন্ধুকে লিখিল, যেন তাহাকে এক পাউণ্ডের একটা কারি-পাউডারের টিন পত্রপাঠ পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হয়। এতৎসহ দাম পাঠানো হইতেছে।

হিসাব করিয়া সমীর দেখিল বড়দিন আসিতে এখনও তের দিন বাকী। সুতরাং ঝিকে রান্নার কাজে ছুটি দিয়া বড়দিনের সময় সে-ই মাংসের ঝোল, মাছের কালিয়া ও ডিমের ডাল্‌না স্বহস্তে রাঁধিয়া পরিচিতদের ভূরি-ভোজন করাইবে, একরকম প্রায় স্থির করিয়া ফেলিল।

লন্দন হইতে ভারশৌ পৌঁছিতে কারি-পাউডারের লাগিতে পারে, খুব বেশী হইলেও এক সপ্তাহ। কিন্তু এক সপ্তাহ ছাড়িয়া দশ দিন কাটিয়া গেল, তখনও কারি-পাউডারের দেখা নাই। পিওন ইলেক্‌ট্রিকের বিল দিয়া গেল, বইএর দোকানের বিল দিয়া গেল, গাদা-গাদা বিজ্ঞাপনসহ

ছাপা-চিঠি দিয়া গেল, রাদি ও কিনিবার তাগাদা, ভালো স্যুট কোথায় তৈরী হয়, তাহাদের সমাচার, ধোপার দোকানের ঠিকানা, কোথায় এক হাল ফ্যাশানের অশনগৃহ খোলা হইয়াছে, তাহার ঠিকানা ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এগার দিনের দিনও পীতকলেবর কারি-পাউডারের শিখাগ্রভাগটি পর্যন্ত দেখা গেল না।

অবশেষে———২৪শে দিসেম্বর তারিখে ডাকহরকরা আসিয়া ঘণ্টার বোতাম টিপিল এবং দরজা খোলামাত্রই সমীরের হাতে পোষ্ট-আফিস হইতে আগত এক টুক্‌রা কাগজ গছাইয়া দিয়া একটি সামরিক সেলামের সাহায্যে প্রতিবৎসর খ্রীষ্ট-জন্মের দিনে তাহার প্রাপ্যটা স্মরণ করাইয়া দিল। কাগজের টুক্‌রাটি পড়িয়া সমীর তাহার যে মর্ম গ্রহণ করিল তাহা এই যে তাহার নামে লন্দন হইতে একটি পুলিন্দা আসিয়াছে, কিন্তু তাহার ভিতর হলুদ রঙের পদার্থটির জাতি-নিরূপণ না হওয়া পর্যন্ত উদ্দিষ্ট ব্যক্তির হাতে তাহা অর্পণ করা যাইতে পারে না। কারণ তজ্জন্য স্বাস্থ্য-মন্ত্রিত্ব, বাণিজ্য-মন্ত্রিত্ব ও রাষ্টকর-মন্ত্রিত্বের অনুজ্ঞা প্রয়োজন। পিওন আর একটি সমরিক সেলাম ঠুকিয়া পরামর্শ দিল, "প্রশেঁ পানা * আপনি বিদেশী লোক, বড় পোষ্ট-আফিসে ৫৪ নম্বর ঘরে একবার নিজে গিয়ে দেখা করলে, প্রশেঁ পানা, আপনাকে তৎক্ষণাৎ আপনার জিনিষ দিয়ে দিবে। ৫৪ নম্বর ঘরে।" বক্‌শিস্ লইয়া পিওন আপাদমস্তক রোমে ঢাকিয়া, অভ্রের মত তুষার-রাশির উপর জুতা দিয়া কিচ্ কিচ্ শব্দ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

দুনো জানালার ভিতর দিয়া সমীর দেখিল বাহিরে রাস্তার দুইপাশে

* পোল-ভাষায় "প্রশেঁ পানা" (পুং), "প্রশেঁ পানী" (স্ত্রী) বা "পানিয়ে" (পুং), আমাদের ভাষায় "মশাই"-শব্দের মত যেখানে-সেখানে অজস্র পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

মানুষের মাথার সমান বরফ জমিয়াছে, এবং তাহার ভিতর দিয়া পথ করিয়া সারি সারি বড়দিনের ক্রেতার দল চলিয়াছে। তাহাদের কালো রঙের রোমের পোষাকগুলা তুষারে শাদা হইয়া গেছে। মানুষের ত্বরিত পদবিক্ষেপ দেখিয়া মনে হয় শীত অন্ততঃ ২২ ডিগ্রী শূন্যের নীচে, এবং উত্তুরে হাওয়া জমা ভীস্‌লা-নদী ডিঙ্গাইয়া ভারশৌ সহরের পথে-ঘাটে প্রেত-নৃত্য সুরু করিয়াছে।

সমীর বহুক্ষণ ভাবিয়া দুইটা ওভারকোট এবং রোমের টুপি ও রোমের দস্তানা আঁটিয়া, গলশ্‌ পরিয়া, তাক্সি করিয়া পোষ্ট-আফিস অভিমুখে ধাবিত হইল। যাইবার সময় ঝিকে বলিয়া গেল, সে নিজে এক মজার জিনিষ রাঁধিবে, সুতরাং রান্নার কাজে তার ছুটি। পথে তাক্সি দাঁড় করাইয়া কিছু উৎকৃষ্ট মেষ-মাংস কিনিতেও সে ভুলিল না। ভেড়ার মাংস ওদেশে একদিন ভিনিগারে জরাইয়া রাখিতে হয়, নচেৎ বোকা গন্ধ মরে না; তাই একদিন আগেই মাংসটা কিনিয়া রাখিল। বাড়ীতে গোটাকয়েক ছোট এলাচ আছে, লবঙ্গ এবং দারুচিনি ত পাওয়াই যায়, সুতরাং গরম-মস্‌লার জন্য ভাবনা নাই। এখন তেলটা কী লওয়া যাইবে, অলীভা না সস্তা দরের অলেই ঝেপাকভ্যী বা অলেই মাকভ্যী কিংবা অলেইল্‌নিয়ান্যী? অবশ্য অলেই ঝেপাকভ্যীটাই নিতান্ত ছোটলোকের খাদ্য হইলেও সরিষার তেলের মত খাইতে। পথে খানিকটা দই এবং কিছু তেজপাতা ও আদার গুঁড়া লইতে হইবে। সমীর রান্নার ফর্দ করিতে করিতে পোষ্ট-আফিসে আসিয়া পৌছিল।

রূপকথার কোষাগারের মত দরজার পর দরজা পার হইয়া ৫৪ নং ঘর—পোষ্ট-আফিসের শুল্ক-বিভাগ। মাঝখানে লম্বা কাঠের কস্তোয়ার, তাহারই দুইপাশে সারি দিয়া দাঁড়াইয়া আছে শ্রীমান্ সমীরের মতই উমেদারের দল ও সবুজ উর্দি-আঁটা কর্মচারী। একটি কর্মচারী তাহার

সম্মুখস্থিত প্রার্থীর আবেদনের রায় দিতেছে—"সুতরাং দেখা যাচ্ছে, এ অ্যাল্‌বাম্ একমাত্র ব্যবসার জন্যেই আমদানী হ'তে পারে। মরোক্কো চামড়ার বাঁধাই, তার ওপর সোণার জলে ফুলকাটা, নিজের ব্যবহারের জন্যে হ'তেই পারে না।" উমেদার নিতান্ত বিনীতভাবে আপন এজাহার সুরু করিতেছে—"প্রশেঁ পানা, পানিয়ে দিরেক্‌তঝে, আমার কাকা, তিনি আজ ছ'মাস হ'লো আমেরিকায় গেছেন, তাই, মানে ইয়ে, এই বড়দিনের এই উপহার পাঠিয়েচেন, মানে ইয়ে, উনি জানেন, আমি অটোগ্রাফ্ জোগাড় কিনা। মানে ইয়ে—"

কর্মচারী নাকের ডগার কাছে, চশমা নামাইয়া কতকটা শিবচক্ষুর ভাব করিয়া গম্ভীরভাবে শুধাইল—"আপনি বলতে চান, এ অ্যাল্‌বাম্ ব্যবসার জন্যে নয়, আপনার নিজের ব্যবহারের জন্যে ?—"

হ্যাঁ, প্রশেঁ পানা।

ঠিক বল্‌চেন ?

হ্যাঁ, প্রশেঁ পানা।

ঠিক ?

আজ্ঞে হ্যাঁ, পানিয়ে দিরেকতঝে।

আচ্ছা বেশ, তবে—

কর্মচারী কন্তোয়ারের ভিতর হইতে একটি মাঝারী আকারের ছিদ্রকল বাহির করিয়া তাহার লৌহময় ওষ্ঠ ও অধরের মাঝখানে অ্যাল্‌বাম্‌খানিকে পুরিয়া দিয়া হাতল টিপিয়া দিল। লোকটি হা-হা করিয়া বাধা দিবার আগেই এ্যাল্‌বামের B-অক্ষর প্রমাণ একটি ছিদ্র মরোক্কো বাঁধনো মলাটখানাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করিয়া ফেলিল। কর্মচারী তাচ্ছিল্য সহকারে অ্যাল্‌বামখানি কন্তোয়ারের একপাশে ঠেলিয়া দিয়া সমীরের প্রতি মনোযোগ ফিরাইল।

সমীর যথাসম্ভব গাম্ভীর্যের সহিত পোষ্ট-আফিসের কাগজের টুক্‌রাটি

কর্মচারীর হাতে দিয়া ইংরেজী সুরে পোল-ভাষায় বলিল—"প্রশে পানা, আমি বিদেশী। আমার নামে একটা পার্সেল এসেছে, সেটা নিতে এসেছি।"

কর্মচারী কাগজের টুক্‌রাটির উপর চশ্‌মাটাকে অনুবিক্ষণের মত ধরিয়া কিছুক্ষণ গভীরভাবে প্রণিধান করিল, যেন অধুনা-অজ্ঞাত কী একটা বৈজ্ঞানিক তথ্য আবিষ্কার করিতেছে, পরে ব্যাঙ্কের কেরাণীর মত পালিশ-করা ভদ্রতার সহিত বলিল—"আপনার পাস্‌পর্ত্‌?" পাশের একটি কর্মচারী ফিস্‌ফিসাইয়া তাহার কানে-কানে বলিল—"হ্যাঁ, বিদেশী না আরো কিছু! নালেফ্‌কীর* বৃটিশ্‌ প্রজা, পালেস্তিন্‌-ফের্তা, আবার বেকিয়ে বেকিয়ে ওর কথা শোন না!"

সমীরের পাস্‌পর্ত্‌ পরীক্ষা করিয়া কর্মচারী শুধাইল—"আপনার জন্ম?" পরে নিজেই যোগ করিল,—"ওঃ এই যে! কাল্‌কুত্তা, কাল্‌কুত্তা।" ইস্কুলে মুখস্থ করা ভুগোলের পাঠ আওড়াইবার মত হুড়্‌-হুড়্‌ করিয়া বলিয়া গেল—"বোম্বাই, মাদ্রাস্‌, কাল্‌কুত্তা, ওসাকা, নাগাসাকি, দেল্‌হী, দার্জিলিং দার্জিলিং থেকে চা আসে। আপনি হিন্দুস্‌!"

হ্যাঁ, প্রশে পানা।

গান্দী, তাগোরে?

না, তাঁরা আমার সম্পর্কে কেউ হন্‌ না।

অর্থহীন কথোপকথনকে যথাসম্ভব স্বল্পায়তন করিবার জন্য সমীর কাজের কথা পাড়িল—"দয়া করে প্যাকেট্‌টা যদি দেন ত বিশেষ উপকৃত হই।"

"প্যাকেট্‌?"—এতক্ষণ যেন ট্রেনে-আলাপী মানুষের সঙ্গে খোশ-গল্প হইতেছিল। "প্যাকেট্‌! ওঃ! হ্যাঁ। তা আপনি ত বেশ পোলভাষা

* ভারশৌ সহরের ইহুদী ঘেত্তো।

ব'লতে পারেন, কোথায় শিখলেন? ঈন্দিয়ে, হিন্দুস্থান, ঈন্দিয়ে বৃতি-ঈস্কিয়ে। তা প্রশেঁ পানা, আপনি হিন্দুস্, ত আপনার মাথায় তুর্বান্ দেখচি না! এই গেল বছর একটা জার্মানী সার্কাস কোম্পানী এসেছিল ভারশৌএ—জী ঈংলিশ্ সার্কাস্ না, কী। সেখানে, প্রশেঁ পানা, কুড়িটা হিন্দুস্ দেখালে, সবার মাথায় তুর্বান্, পানিয়ে, যেন এক-একজন মাহারায়া! কী বলেন আপনারা, মাহারায়া না মাহারাড্জা? কী? মহা-রাজ্জা! মহারাজ্জা, মহারাজ্জা। কিছুদিন আগেও দেখেচি, এই ভারশৌতেই একজন মহারাজ্জা ছিলেন, পানিয়ে, মাথায় ইয়া তুর্বান্! তবে মানে ইয়ে—ভারশাভীয়ান্কাদের * তাঁর ভারী পছন্দ। আমারই এক আত্মীয়ের বাড়ী তাঁর নেমন্তন্ন হয়েছিল একদিন, তা সে বলে পানিয়ে, সারাটি সন্ধ্যে ধরে' পান্ মহারাজ্জা ভারশাভীয়ান্কাদের সুখ্যাতি ক'রেচেন, বলেন, এত দেশ ঘুরেছি পানিয়ে, ও তোমার ইতালিয়া, ফ্রাঁস্, ইস্পানিয়া, কিন্তু ভারশাভীয়ান্কাদের মত সুন্দর মেয়ে আমি দেখি নি।"

একটু মনরাখা কেঠো হাসি হাসিয়া সমীর আবার কাজের কথা পাড়িল—"প্রশেঁ পানা, প্যাকেট্টা—"

"ও হো, প্যাকেট্!—এই যে হ্যাঁ, বলি এই স্তেফানিয়ে, স্তেফানিয়ে, গিয়ে বল্ পান্ দিরেক্তরকে, এখানে এক পান্ হিন্দুস্ এসেচেন, কাল্কুত্তা থেকে। তাঁর একটা কী পার্সেল না কী এসেচে। নম্বর, নম্বর—এই নিয়ে যা কাগজটা, নম্বর এতে আচে। তা, প্রশেঁ পানা, আমাদের দেশ আপনার লাগচে কেমন? ক্রাকুফ্ দেখেচেন? ভীল্নো? ল্ভূফ্? শীতে আপনার কষ্ট হয় না? আচ্ছা, একটা কথা বলুন ত, পানিয়ে, সত্যি করে', শুনতে পাই, কিন্তু নিজের চোখে না দেখলে, পানিয়ে, বিশ্বাস হয় না। আপনাদের য়োগা না কী বলে, তারা নাকি—"

* ভারশৌএর অধিবাসিনীগণ।

সশরীরে "হিন্দুসের" আগমনে স্বয়ং পান্ দিরেক্তর নীচে নামিয়া আসিয়াছেন। সমীরকে দেখিয়া বেশ একটু আশ্চর্য হইয়া দিরেক্তর শুধাইলেন—"আপনি হিন্দুস্, মাহারায়া?" সমীর উত্তর দিবার আগেই কর্মচারী সংশোধন করিয়া দিল—"পানিয়ে দিরেক্তঝে, 'মহারাজ্জা', আমরা ভুল করে' বলি, 'মাহারায়া'।"

"মাহারায়া" লইয়া নূতন প্রসঙ্গ উঠিবার আগেই সমীর কাজের কথা পাড়িল—"পানিয়ে দিরেক্তঝে, আমার নামে একটা পার্সেল এসেছে, সেটা পেলে বিশেষ উপকৃত হই।"

পার্সেল? হ্যাঁ, পার্সেল বটে—কিন্তু—উ—উ—তাত আপনাকে আমরা দিতে পারবো না। এ-জিনিষ এদেশে আনবার হুকুম নেই।

কী জিনিষ?

কী জিনিষ, শুনবেন? স্তেফানিয়ে, স্তেফানিয়ে, এই স্তেফানিয়ে, ডেকে নিয়ে আয় বড়বাবুকে! ও-জিনিষ, পানিয়ে যার কাছে পাওয়া যায় তার মোটা জরিমানা হয়, প্রশেঁ পানা!

বড়বাবু সমীরের প্রতি গভীর রহস্য-পরিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বেশ একটু কঠোরভাবে কহিলেন—"প্রশেঁ পানা, আপনাদের দেশে নাকি আকছার এ-মালের চলন, কিন্তু ইউরোপে ('ইউরোপ' কথাটার উপর জোর পড়িল) এসব জিনিষ ব্যবহার করে দুশ্চরিত্র ব্যক্তিরা, তাও অতি গোপনে।"

কী জিনিষ?

কী জিনিষ, আপনারই জানা থাকা উচিৎ। যদি ভান করেন যে জানেন না, ত নামটা আমি পুলিসের সামনেই ক'রতে চাই।

আরে, প্রশেঁ পানা, আপনাদেরই একজন নামজাদা ব্যবস্থাপকসভার

সভ্য এ-জিনিষ খেয়ে, এদেশে যাতে এর চলন হয়, সে চেষ্টা ক'রবেন ব'লেছেন।"

বটে ?!! কোনো সম্ভ্রান্ত ব্যবস্থাপকসভার সভ্যের নামে একরকম বদনাম রটানোর ফলাফল বোধ করি আপনার জানা আছে।

বদনাম ?!

বদনাম নয় ত কি সুনাম !? ভাল-তাল গাঁজা, গুলি, চণ্ডু, চরোশ খাওয়া কী সুনাম পানিয়ে ? (কৌটা দেখাইয়া) এই কৌটোভরা যে এতখানি গাঁজা না সিদ্ধিজাতীয় কী পদার্থ, মেদ্ ঈন্ ঈন্দিয়া, তা কী আপনার অজানা ?

গাঁজা ?! আরে পানিয়ে, এ-জিনিষে আমাদের নাড়ী কাটা। জন্মাবধি আমরা এ-জিনিষ খেয়ে আসছি, আর আপনি বলেন—

বলেন কী, ছেলেবেলা থেকেই এ-জিনিষ খান্ আপনারা ? আর কাল আমার এক সহকর্মচারী, ভদ্রলোকের খুব কড়া জিনিষ খাওয়া অভ্যেসে, বলে, দিন্ না পানিয়ে, একটু চেখে দেখা যাক্, বলে', পানিয়ে, তার পাইপের সিকি-পাইপ্ ভরে' দেশলাই জ্বাললে। তারপর সেই যে 'আমার শরীরটা কী রকম করছে', বলে', তাক্সি করে' বাড়ী গেল, আর তার দেখা নেই। আজ বেচারা আর আফিসে আসেনি।

ভারতবর্ষের ওঝারা যাহা পোড়াইয়া তাহার গন্ধে ভূত, প্রেতিনী, ব্রহ্মদৈত্য, শঙ্খচূর্ণী, স্কন্ধকাটা প্রভৃতি মহা মহা আত্মাদের আত্মারাম খাঁচা-ছাড়া করাইয়া দেয়, তাহার ধোঁয়া যে বেচারা কর্মচারীর শরীরে অবাধে প্রবেশ করিয়া কণ্ঠনালী দিয়া ফুস্‌ফুস্ পর্যন্ত বারকয়েক টহল দিয়া নাসারন্ধ্র-পথে নিঃসৃত হইয়াছে, তাহা মনে করিয়া সমীরের গায়ের ভিতরটায় দড়ি-পাকানোর মত পাক দিতে লাগিল। ব্যাপারটা অনর্থক যাহাতে বেশীদূর গড়াইতে না পায়, সেইজন্য সমীর যথাসম্ভব সংক্ষেপে

কারি-পাউডারের একটা বিবরণী দিয়া কহিল—"প্রশেঁপানা, এ সুধু খাদ্য নয়, আমার কাছে এ একেবারে ওযুধের সমান। ছুটি বেলা যদি আমাদের পেটে ঐ জিনিষটি একটু করে' না পড়ে ত এক টুক্‌রো রুটি হজম করে কার সাধ্যি! যার যেমন অভ্যেস পানিয়ে। আমার কাছে এ আহার ওযুধ দু'ই।"

কিছুক্ষণ ধরিয়া এ ওর দিকে তাকাইতে লাগিল। পরে বড়বাবু, একটিপ নস্য লইলে নস্যি-খোরের মুখখানা যেমন প্রসন্ন-গম্ভীর হইয়া ওঠে, সেইরকম ভাব করিয়া বলিলেন—"বলেছিলুম কিনা, পানিয়ে, এর মধ্যে কোনো গুরুতর ব্যাপার আছে! এখন বোঝা গেল, এ কোনো গুপ্ত ওযুধ, মেদ্ ঈন্ ঈন্দিয়া।" পরে চুপি চুপি পান্ দিরেক্‌তরের কানে-কানে কহিলেন—"মনে আছে কি, পানিয়ে দিরেক্‌তঝে, গত বছরের কাণ্ডটা? এক ব্যাটা ইহুদী এই কম্ম করছিল! বিদেশ থেকে আনা কী একটা বড়ি খাইয়ে দেশের মেয়েদের সর্বনাশ করছিল!"

পান্ দিরেক্‌তর কঠোরস্বরে সমীরকে শুধাইল—"আপনি ব'লতে চান্, এটা খাবার জিনিষ?"

আজ্ঞে হ্যাঁ, পানিয়ে দিরেকতঝে। বিশ্বাস না হয় ত পরখ ক'রেই দেখুন না।

পান্ দিরেক্‌তর কৌটা খুলিয়া পদার্থটা মুখে দিবার আগে জীব-জগতের স্বভাবসিদ্ধ রীতিতে তাহার একটু আঘ্রাণ লইলেন ও সঙ্গে-সঙ্গে বেসামাল হইয়া পার্শ্বেই দণ্ডায়মান বড়বাবুর টেকো মাথার উপর বিরাশি-সিক্কা ওজনের একটা হাঁচির ঝটিকাঘাত করিলেন।

সমীর প্রস্তাব করিল, সে ঐ কৌটার ঢাক্‌নায় যতটা ধরে ততটা খাইয়া দেখাইয়া দিবে পদার্থটা সম্পূর্ণ নির্দোষ। তাহার কথা শুনিয়া এই অভাবনীয় কাণ্ড দেখিবার জন্য কর্মচারীরা আপন-আপন কাজ ছাড়িয়া

ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। সমীর অসঙ্কোচে ঢাক্না-পরিমাণ কারি-পাউডার মুখে ফেলিয়া তাহা অনায়াসে গলাধঃকরণ করিল। পান্ দিরেক্তর্ ও বড়বাবু উভয়েই ম্রিয়মান সমীরের প্রতি ফেল্-ফেল্ করিয়া তাকাইয়া ভারতীয় যোগী-পুরুষদের করায়ত্ত রসি-ভেল্কি বা ঐ-ধরণের কিছু একটা যাদু-কারসাজির প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

প্রথমোক্ত কর্মচারী দেরাজ খুলিয়া একমুঠো আল্পিন আনিয়া সমীরের সাম্নে ধরিয়া কহিল—"পানিয়ে, এ বাজীটাও দেখিয়ে দেবেন নাকি? সেবার ঈংলিশ্ সার্কাসে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল যে দেখাবে, কিন্তু আগুন-খাওয়া দেখালে বটে, তবে মুঠো মুঠো কাঁটা পেরেক কোয়েকার ওট্সের মত কচ্মচিয়ে চিবিয়ে খাবার খেলাটা দেখালে না।" সঙ্গে-সঙ্গে রব উঠিল—"হ্যাঁ পানিয়ে, হ্যাঁ পানিয়ে, আর মানুষের মুণ্ডু কেটে তাকে জোড়া দেওয়ার খেলাটা, আর জুতোর ভেতর থেকে সাপ বার করবার খেলাটা, এই পান্ দিরেক্তরেরই জুতোর ভেতর থেকে বার করুন না, পানিয়ে, আর কী বলে, সেই চোখের নিমিষে গাছ গজানোর খেলাটা, আর মুঠোর ভেতর থেকে আংটি ওড়াবার খেলাটা, আর সেই যে কী বলে, পানিয়ে মনে পড়ছে না, হ্যাঁ, ওভারকোটের ভেতর থেকে একটী ফুট্ফুটে সুন্দরী মেয়ে বার করবার বাজীটা, এই আমার ওভারকোটের ভেতর থেকে—হ্যাঁ, সেইটে, সেইটে, পানিয়ে, প্রঁশেঁ পানা, দোহাই আপনার—"

কর্মচারীদের কাছ হইতে কোনোরকমে রেহাই পাইয়া সেই দারুণ শীতে ঘর্মাক্তকলেবর, অবসন্নদেহ সমীর বাড়ী ফিরিয়া পোষ্ট-আফিসের বিধাতাকে একখানি পত্রে আপন নালিশ জানাইল।

তাহার পর ভারশৌএর পথের একহাঁটু বরফ উষ্ণ রৌদ্রকিরণে গলিয়া ভীসলা-গর্ভে মিশিল, শীত কাটিয়া বসন্ত উত্তীর্ণ হইল, এবং গ্রীষ্মের প্রথমে

"সবুজ-উৎসব" * আসিয়া পড়িল। ছুটির দিনটায় সমীর কল্পনার চক্ষে পাঁচজন বন্ধুবান্ধবীদের লইয়া কারির সসে অভিষিক্ত রাজহংসের পদযুগল, পক্ষদ্বয়, নিটোল বক্ষ প্রভৃতি শরীরাংশের তারিফ করিতেছে, এমন সময়ে তাহার সাকাঙ্ক্ষ ইচ্ছাশক্তির জোরে বিধাতার টনক নড়িল। ঝি আসিয়া ডাকহরকরার শুভাগমনবার্তা ঘোষণা করিল, এবং তাহারই পিছনে একটি সসম্ভ্রম সামরিক দণ্ডবতের সাহায্যে পিওন একটা মোটা রকম বক্‌শিসের পূর্বাভাষ দিল।

"গ্জেন্ দব্রি পান্থ। † এতদিন পরে এল আপনার জিনিষ। ব'লে-ছিলুম কি না, যে আপনি পানিয়ে বিদিশী মানুষ, হেঁ হেঁ, তাছাড়া সারা পোষ্ট-আফিসে কে না জানে, আপনি হেঁ হেঁ, কি বলে, মাহারাজ্‌জা! আমি অবিশ্যি আপনাকে প্রথম দিন দেখেই আমার স্ত্রীকে ব'লেছিলুম, বলি আজ একজনের সঙ্গে দেখা হ'লো, তিনি হ'চ্ছেন হিন্দুস্‌, মাহারাজ্‌জা—"বলিতে বলিতে, চাম্‌ড়ার ঝোলা খুলিয়া একটা পুলিন্দা অতি সন্তর্পণে টেবিলের উপর রাখিল। তাহার পর এক টুক্‌রা কাগজসহ এক লম্বা ফর্দ সমীরের হাতে গছাইয়া দিল।

বিল আসিয়াছে ২৫ জ্‌লতী, ৫০ গ্রশ্‌ ‡। তাহার মধ্যে কারি-পাউডারের রাসায়নিক পরীক্ষার মজুরী প্রভৃতির সঙ্গে লেখা আছে কারি-পাউডারে পোষ্ট-আফিসের গুদামঘরে ছয় মাস দশ দিনের ভাড়া এত, এবং শুল্ক বাবদ এত। ফর্দ-সংলগ্ন কাগজের টুক্‌রাটির সার মর্ম এই ঃ

নিতান্ত দুঃখের সহিত জানানো হইতেছে যে, ভবিষ্যতে এতদ্বিধ

* পোলভাষায় "ঝেলনে শ্বান্ত্‌কি", জুন মাসে অনুষ্ঠিত হয়।

† সুপ্রভাত।

‡ ১২৸০।

দ্রব্যের, যে-কোনো উদ্দেশ্যেই হউক, আমদানীর জন্য বাণিজ্য, স্বাস্থ্য ও রাষ্ট্রকর-মন্ত্রিত্বের অনুজ্ঞা আবশ্যক। প্রথমে পদার্থ টি কী, তাহা বহু পরীক্ষা সত্ত্বেও জানা যায় নাই। পরে কৌটার উপর স্পষ্টাক্ষরে লিখিত "Curry Powder," সকল প্রশ্নের সমাধান করিয়া দেয়। ভারশৌএর এক খ্যাতনাম্নী সৌন্দর্য-নিপুণা মত দেন যে, মহিলাদিগের মধ্যে যাঁহারা সখ করিয়া সারাদিন রোদে পুড়িয়া সামান্য কৃষ্ণাঙ্গী হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে পারী হইতে এই জাতীয় মুখ-রেণু আমদানী করা হইতেছে।

ডাকহরকরাকে বিদায় দিয়া সমীর যখন কারি-পাউডারের কৌটা খুলিয়া তাহার আঘ্রাণ লইল, তখন সে আশৈশব-পরিচিত পিসিমার বড়ি-ছেঁচকির উপকরণ, লঙ্কা, হলুদ, ধনে ও সরিষার সংমিশ্রণটিকে চিনিতে পারিল না। ওদ্‌কলঞ্‌, মিৎসুকো, কন্‌ভালিয়া, স্যাঁ ফ্ল্যর্‌, নাৎর্সিস্‌, রেন্‌ দে রোজ্‌, এবং আরো শত-শত জ্ঞাত ও অজ্ঞাতকুলশীলাদের সহিত দীর্ঘ ছয় মাস দশ দিনের সহবাসে আমাদের এই ভেতো বাঙ্গালীর বাচ্চা বেঙ্গল কারি একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়াছে।

একটু জিভে দিয়া সমীর দেখিল, স্বাদ বাটনার বটে, তবে গন্ধে সে যে-কোনো উৎকৃষ্ট মুখ-রেণুকে হার মানাইতে পারে।

কলিকাতা,
১২ই চৈত্র, ১৩৪৭

ভূর্‌লাক্

সারাদিন ধরিয়া পথ চলিবার পর সন্ধ্যার কিছু আগে পা দুইটা যখন জগদ্দল পাথরের মত ভারী ও নিসাড় হইয়া উঠিয়াছে, তখন হিসাব করিয়া দেখিলাম, পরবর্তী ক্ষুদ্রতম জনপদ সেখান হইতে প্রায় তিন ক্রোশ। তপল্‌নীৎসা নদী পার হইয়া জামশ্চ্‌। জামশ্চের প্রাচীন সৌধাবলী, নরনারীর অঙ্গসৌষ্ঠব ও ভাষার লালিত্য তাহার বিলুপ্ত বংশ-গৌরবের পরিচয় দেয়। তাহার পর মাঠের পথ ধরিয়া, চাষার ঘর, ক্ষেতখামার ও চারণভূমি ছাড়াইয়া ভিয়েপ্‌শেৎস্‌। ভিয়েপ্‌শেৎস্‌ হইতে রাহদশ্‌ প্রায় সাত ক্রোশ। চলিতে চলিতে পথ ক্রমে জনবিরল হইয়া আসে, এবং আচম্বিতে চোখের সুমুখে আসিয়া দাঁড়ায় উদাত্ত বনানী, পত্র-পল্লব শাখা-প্রশাখার অবারিত বিস্তার আকাশ ধরিয়া ধরিয়া একেবারে দিগন্তে গিয়া ঠেকিয়াছে।

ক্ষেত হইতে সদ্য-তোলা আলুর বস্তা-বোঝাই, গাড়ীখানার দুই পাশে চাষী মেয়ের দল, মাথায় রঙিন রুমাল বাঁধিয়া খালি পায়ের অবাধ চলার

তালে তালে ঘাঘ্‌রা নাচাইয়া, যেন দিন ও রাত্রির সন্ধিরেখা টানিয়া টানিয়া, কোন্ অদৃশ্য লোকালয় লক্ষ্য করিয়া চলিয়াছে।

মাঠের যে-অংশটায় অরণ্যের পূর্বরাগ, ছোট ছোট ঝোপ-ঝাড়ে পৃথিবীর বুকে সবুজের শিহরণ জাগাইয়াছে, সেইখানে গাড়ী থামাইয়া তাহারা লাল বঁইচের মত বরূফ্‌কি তুলিয়া আপন-আপন এপ্রন্ ভরাইতে লাগিল।

কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, রাহ্‌দশের পথে ধারে-কাছে রাতের মত কোনো আশ্রয় পাওয়া যাইবে কিনা।

"রাহ্‌দশ্‌" !—সর্ব-কনিষ্ঠার নিটোল কণ্ঠস্বর "হ্"-অক্ষরের উপর লাস্য-বিলাসে ঢলিয়া পড়ে—"রাহ্‌দশ্‌! হেই পানিয়ে,* সে অনেক দুর, জঙ্গলের ভেতর দে' পথ, এখন নেকৃড়ে নেই বটে, তবে—"

এ-অঞ্চলের কী একটা দুর্দ্ধর্ষ ভয় যেন তাহাদের অভিভূত করিয়া ফেলিল, লক্ষ্য করিলাম। তাহারা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিয়া চোখের ভাষায় বলাবলি করিতে লাগিল, এই ভর-সন্ধ্যোবেলা কথাটা মনে না করিলেই হইত। তাড়াতাড়ি বরূফ্‌কি তোলা সাঙ্গ করিয়া, কোঁচড় গুটাইয়া, কপালের উপর ঝাঁপাইয়া-পড়া অতসী-বরণ চুলের গোছা মাথার রঙিন রুমালটার ভিতর গুঁজিয়া দিয়া, যাইতে প্রস্তুত হইল।

তাহাদের মধ্যে বয়সে সবচেয়ে বড় মেয়েটি একটু ইতস্তত করিয়া আগাইয়া আসিয়া সাবলীল উক্রাইনী ছন্দে পোল ভাষায় বলিল—"এই আঁধার রাতে কোথায় যাবে গো, বাপু? আমরা থাকি এই জঙ্গলের ভেতর, নায়েব বাবুর কুঠীতে, ক্ষেতখামারের কাজকম করি। এসো

* পোল ভাষায় "পানিয়ে" (পুং), "প্রশেঁ পানা" (পুং), "প্রশেঁ পানী" (স্ত্রী), আমাদের ভাষায় "মশাই"-শব্দের মত যেখানে-সেখানে কথার ফাঁকে ফাঁকে অজস্র পরিমাণে ব্যবহৃত হয়।

আমাদের সাতে। আপনারা হ'চ্ছ ভদ্দরনোক, পান্ নায়েব ভদ্দরনোকের মুখ দেখেন নি আজ কতদিন!" পরে নিতান্ত সমীহভরে যোগ করিল—"কথায় বলে, অতিথ এলো দোরে, না ঠাকুর এলেন ঘরে, পান্ নায়েবের বাড়ীতে জায়গা না হ'লে, তাতা * আমাদের কুঁড়েতেই জায়গা করে' দেবে'খন।"

শেষ কথা কয়টা বলিবার সময় তাহার কোঁচড় হইতে লাল চক্‌চকে পুঁতির মত বরুফ্‌কিগুলা ছর্ ছর্ করিয়া ছড়াইয়া পড়িল। তাহার অবস্থা দেখিয়া সখীরা স্বচ্ছন্দ কলহাস্যে অরণ্যের কুঞ্চিত-ভ্রূ, সান্ধ্যায়মান গাম্ভীর্যকে বহু দূর পর্যন্ত অপসারিত করিয়া দিল।

"ভী—ও! হেৎ—তা!" বলিয়া দলের একটি মেয়ে ঘোড়ার লাগাম তুলিয়া লইয়া, তাহার মসৃণ, তাম্রাভ পৃষ্ঠে মৃদু আঘাত করিল। এবং পথের পাথরে মুহুর্মুহু স্খলিতচক্র শকট দুরন্ত শিশুর মত টলিতে টলিতে বনানীর বুকে ঝাপাইয়া পড়িল।

মাথার উপর, যতদূর দৃষ্টি চলে, সবুজ পটভূমির কোলে হেমন্তের পত্রপুষ্পের হেম আলিম্পন, মাঝে মাঝে আকাশের অবকাশ এবং শতাব্দী-বৃদ্ধ সস্না, তপলা, বুক্, গ্রাব্, ও নবোন্মেষিত রাঝোগ্নীনা, চেরেম্হা'র অপ্রতিহত পরিবেষ্টন কী এক বিচিত্র আল্‌হাম্‌ব্রা রচনা করিয়াছে। সেই অপূর্ব বনসৌধের চন্দ্রাতপতলে কে যেন অতি সন্তর্পণে একটি একটি করিয়া তারার প্রদীপ জ্বালিয়া দিল। ক্ষীণপ্রভ নক্ষত্রের আলোকে কোনোমতে পথ চিনিয়া, পরিচিত সস্না, দম্ব্ বা তপলাকে দক্ষিণে, বামে রাখিয়া মেয়েকয়টি নিঃশব্দে অগ্রসর হইতে লাগিল। একটু দূর হইতে অন্ধকারের বুকে তাহাদের অধোবদন, অস্পষ্ট রেখা-মূর্তি দেখিয়া মনে হয়, তাহারা যেন মুহ্যমান পদক্ষেপে শবের অনুগমন করিতেছে।

* বাবা

কিছুক্ষণ পথ চলার পর বনবেষ্টনী ঈষৎ শিথিল হইয়া আসে, এবং পাহাড়-ঘেরা হ্রদের মত খানিকটা খোলা জায়গা অল্‌শীনা ও বন-মালীনার পাতার ফাঁকে ফাঁকে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করে। দূরে মাঝে মাঝে একটি একটি করিয়া আলো ফুটিয়া ওঠে, যেন পর্বতের গহন অধস্তলে হ্রদের শৈবাল-কৃষ্ণ বক্ষে নক্ষত্রের স্তিমিত ছায়াপাত হইয়াছে।

এক হাঁটু আগাছার জঙ্গল ভাঙ্গিয়া আমরা একেবারে উন্মুক্ত আকাশের তলায় আসিয়া পড়িলাম। অরণ্যের মুষ্টিবন্ধনের মধ্যে এই সামান্য একটু আলো-বাতাসের মুক্তির জন্য মেয়েকয়টির প্রাণ যেন উন্মুখ হইয়া ছিল। বনস্পতির শীর্ষে শীর্ষে হাল্‌কা গান ও দিল-খোলা হাসির প্রতিধ্বনি তুলিয়া, সুস্থ দেহের অসংযত আনন্দে দিগন্ত বিচ্ছুরিত করিয়া তাহারা পথ চলিতে থাকে। হঠাৎ শুনিতে পাই, "ব্‌র্‌—র্‌—র্‌, ব্‌র্‌—র্‌—র্‌" শব্দে তাহারা অশ্বের গতিরোধ করে। চাহিয়া দেখি, আমরা যেন কোন্ ঐন্দ্রজালিকের মায়ার বশে চোখের নিমেষে দূরত্ব অতিক্রম করিয়া, একেবারে নায়েব-কুঠীর প্রবেশ-দ্বারের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি।

নায়েব-পরিবার, কয়েক ঘর চাষা, কিছু জমীজমা ও গৃহপালিত পশু, এই লইয়া অরণ্যের অন্তঃস্থলে যে উপনিবেশটি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহাকে দেখিয়া মনে হয়, যেন ইহারা দক্ষিণ আমেরিকার কোন্ এক উত্তুঙ্গ পর্বতের প্রাচীর-বেষ্টিত উপত্যকায় বহুকাল ধরিয়া বসবাস করিয়া বর্হির্জগতের সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে সম্পর্ক-বিচ্যুত হইয়া গেছে। বনভূমির বাহির হইতে আমার আগমনবার্তায় স্বয়ং নায়েব ছুটিয়া আসিয়া আমায় সুধু আলিঙ্গন করিতে বাকী রাখিলেন, এবং আমার স্নানাহারের ব্যবস্থা করিবার জন্য দাসদাসী ও বাড়ীর সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন।

সেইদিনই প্রভাতে জঙ্গলের ভিতর কয়েকটা বন-খরা ধরা পড়িয়াছে, এবং ইহারই দু'একদিন আগে বেশ বড়গোছের একটা হরিণ

মারা হইয়াছে। বাড়ীর ভিতের তলায় পিপা-ভরা, মিহি করিয়া কাটা বাঁধা-কোপি, আপেলের টুক্‌রা ও গাজর-কুচি এবং মৌরী ও ধনে দিয়া জরানো আছে। গৃহকর্ত্রী খরা ও হরিণের মাংস এবং তাহাতে এটা ওটা সেটা মিশাইয়া অপূর্ব "পাতে" প্রস্তুত করিয়াছেন। আগের দিন সমগ্র উপনিবেশের জন্য বালিশের মত বড় বড় দেহাতী পাঁউরুটি সেঁকা হইয়াছে। দুধ, ছানা ও মাখনের অভাব নাই। এবং আনুষঙ্গিকরূপে আপেলের পিঠা তৈরী করা হইতেছে। সুতরাং এই অরণ্য-নির্বাসী পরিবারে অতিথি-সংকারের অনুষ্ঠানের কোনো ত্রুটি নাই।

সান্ধ্যভোজনের শেষ পদ আসিয়া পৌছিতে পৌছিতে রাত্রি প্রায় একটা বাজিয়া গেল। নায়েব আমাকে লইয়া বৈঠকখানার আগুনের ধারে আসিয়া বসিলেন। অগ্নিকুণ্ডে দুইটা লোহার শিকের উপর একটা সস্‌নার গুঁড়ি দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। তাহারই আলোতে আমরা দুইজনে মুখোমুখি বসিলাম। বন-মালীনার জ্যাম ও আরক মেশানো দুই গেলাস চা দিয়া গৃহকর্ত্রী রাত্রের মত বিদায় লইয়া গেলেন। হাতে-তৈরী চেরী-কাঠের পাইপ ঠুকিয়া সাফ করিতে করিতে নায়েব আমার দিকে তামাকের বগলী আগাইয়া দিলেন। পরে অগ্নিকুণ্ড হইতে একটা শুক্‌নো দম্বের ডাল জ্বালাইয়া আমার পাইপের উপর ধরিলেন। প্রজ্বলিত সস্‌নার আলো ও গন্ধে এবং পাইপের ধোঁয়ায় ঘরটার ভিতর এমন একটি আবহাওয়ার সৃষ্টি করিল যাহাতে অতি সাধারণ কথোপকথনও গল্পের মত দানা বাঁধিয়া ওঠে।

বাহিরে হেমন্তের পাতা-ঝরানো ঝড় ও অবিরত বৃষ্টি উন্মাদিনীর অসান্ত্বন ক্রন্দনের মত বন হইতে বনান্তরে হাহাকার করিয়া ফিরিতেছে। সদ্য নির্বাপিত পাইপে গোটাকয়েক নিষ্ফল টান দিয়া নায়েব সহসা শুধাইলেন, "জান্‌লার বাইরে কাউকে দেখলেন ?"

না।

তা হ'লে আমার চোখের ভুল।—পরে কতকটা সবাক্ চিন্তার মত যোগ করিলেন—ব্যাটাকে শেষ ক'রেছি, কিন্তু তবুও কি নিস্তার আছে? তার পাগ্‌লী মাটা সারারাত ধরে' বনে বনে কেঁদে কেঁদে বেড়ায়। কি জানি, হয়তো আমার মনের ভুল!

লক্ষ্য করিলাম, এই ঝড় বাদলের রাতে কিসের দুর্নিবার উদ্বেগে নায়েবের মন উৎকন্ঠিত হইয়া উঠিয়াছে। শিষ্টতা রক্ষা করিবার জন্য নিহত ব্যক্তি সম্বন্ধে কৌতুহল প্রকাশ করায় নায়েব গেলাসের আরক-সুবাসিত চাটুকু নিঃশেষ করিয়া তাঁহার কাহিনী সুরু করিলেন।

আপনি কি ভিয়েপ্‌শেৎস্ দিয়ে এলেন? পথে আসতে আসতে যে-টুকু বন দেখেছন তাকে বন বলাও যা, আর মাছিকে হাতী বলাও তাই। প্রশেঁ পানা, সত্যিকার বন যদি দেখতে চান্ ত কালকের দিনটা থেকে যান্, শিকোরে বেরুনো যাবে'খন। এই বৈঠকখানার পেছন দিকটায়, অবশ্য এখন অন্ধকারে কিছু দেখা যাবে না, সুধু শ'খানেক শ' দুই হাত খোলা জমী, তার পরই জঙ্গল। এমন জঙ্গল এদেশে খুব অল্পই দেখা যায়। আফ্রিকা বা দক্ষিণ আমেরিকার যে-সব জঙ্গলের বিবরণ পড়েছি, তাতে মনে হয় আমাদের অঞ্চলের এই জঙ্গলটি তুলনায় খুব কম হবে না। পানিয়ে! সে জঙ্গলে মাথা গলায় কার সাধ্যি! কতরকমের যে গাছ আছে পানিয়ে, তার ইয়ত্তাই হয় না। কয়েক বছর আগে বাবুদের এক বন্ধু এসেছিলেন, কোথাকার এক নামজাদা বতানিকা'র প্রফেসার, তা তিনি ঐ জঙ্গলে ঢুকে বলেন, "প্রশেঁ পানা, আমার যা বিদ্যে তাতে এসব

গাছপালা নিয়ে গবেষণা করা চলে না। বছর দশ-পনেরো পড়াশুনো করে' আবার আসা যাবে।" আর কত রকমেরই যে জন্তুজানোয়ার! ছোট ছোট খরা থেকে আরম্ভ করে' হরিণ, খেঁকশিয়াল, বুনো শোর, নেক্‌ড়ে, এমন কি ঋষ্‌ * পর্যন্ত! খুঁজলে যে দু'একটা ভাল্লুকও পাওয়া যাবে না, এমন বিশ্বাস হয় না। তাছাড়া এত রকমের পাখী সারা ইউরোপে দেখা যায় কিনা সন্দেহ। সাপ-খোপেরও অভাব নেই, পানিয়ে। এক কথায়, ঐ ক্রোশ দুই-তিন জুড়ে যে জঙ্গলটা, ওর ভেতর যে কী আছে না আছে তা কেউ বলতে পারে না। কখনো কখনো গাছ কাটাবার জন্যে বা শিকার করতে যাই বটে, কিন্তু ভেতরে ঢুকে বাইরের এই খোলা একটু আলো-বাতাসের জন্যে প্রাণটা হাঁপিয়ে ওঠে, মনে হয় যেন কোন্ বন-দানব তার লক্ষ-লক্ষ হাত বাড়িয়ে গলার টুঁটি চেপে ধরতে আসছে। এই জঙ্গলে আর যাই থাক, এর শত-সহস্র দৃশ্যমান ও অদৃশ্য বাসিন্দার মধ্যে একটি জীবের সন্ধান পাওয়া গেল, যার অত্যাচারে এ-অঞ্চলের সবাই অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। সেটি একটি মানুষ। নাম, তুর্‌লাক্।

এখন অবশ্য তাকে মানুষ বলছি, কিন্তু যখন সে বেঁচে ছিল, তখন সে যে কে বা কী, তা কেউ জানতো না। সবাই জানতো তার নাম তুর্‌লাক্। কিন্তু এই তুর্‌লাক্‌কে এ-অঞ্চলের চাষা-ভূষোরা একটা জিন্-টিন্ গোছের কিছু বলে' মনে ক'রতো, কারণ তার কার্যকলাপ ছাড়া তার বাস্তবিক অস্তিত্বের কোনো চিহ্নই সে কখনও রেখে যেত না।

আমি, প্রশেঁ পানা, আজ তিরিশ বছর বাবুদের জমীদারী দেখাশুনো করছি। রুশীদের আমলে প্রফেসারের সঙ্গে ঝগড়া করে' লেখাপড়া ছেড়েছি, সে ত আজকের কথা নয়! পানিয়ে সেই থেকে আজ তিরিশ বছর ধরে' বাবুদের জমীদারীর এমন জায়গা নেই, যেখানে আমি ঘুরি নি।

* এক প্রকার বাঘের মত বন-বিড়াল। সম্ভবতঃ সং ঋক্ষ শব্দের সহিত সংশ্লিষ্ট।

এবং বাবুদের জমীদারীর বহরটা ত আপনার জানাই আছে। ইউরোপের পূর্ব অঞ্চলে তাঁদের নাম জানে না, এমন কে আছে? এই তিরিশ বছর ধরে' কত বনে জঙ্গলে ঘুরেছি তার ইয়ত্তা নেই, এক-এক জায়গায় পাঁচ-সাত বছর করে' থেকেওছি। ব'ললে হয়তো অনেকে হেসে উড়িয়ে দেবে পানিয়ে, কত রাতে স্বচক্ষে দেখেছি, গাছের ডালের ওপর বসে' বেঁটে বেঁটে হোহ্লিক্রা * থিক্-থিক্ করে' হাস্ছে, কিংবা আমার সাম্নে এই হাত পঞ্চাশ দূরে আগাছার জঙ্গল মাড়িয়ে মাড়িয়ে হুড়মুড়িয়ে হেঁটে চলেছে অতিকায় বন-দানব, প্রকাণ্ড গাছের মত, তার গা বেয়ে লম্বা লম্বা মসের মত রোঁয়া মাটিতে লুটিয়ে চলেছে। পানিয়ে, এসব আমার চোখে দেখা জিনিষ, তা আপনারা বিশ্বাস করুন আর নাই করুন। জীবনে অনেক দুর্দ্ধর্ষ জিনিষ চোখে পড়েছে, কিন্তু তুর্লাকের সঙ্গে তুলনা দেবার মতও কিছু দেখলাম না, আজ পর্যন্ত।

বাবুদের এই মহলটায় আসি প্রায় পাঁচ বছর আগে, এই পাঁচ বছর ধরে' সে আমায় যে-ভোগনটা ভুগিয়েছে তা আমি জীবনে ভুলবো না। আমার এখানে আসাটাও একরকম দুঃসাহসিক কাজ বলা যেতে পারে। কারণ আমার আগে যিনি ছিলেন তিনি সপরিবারে এই তুর্লাকের হাতে প্রাণ হারান। কী ভাবে তাঁদের খুন করা হয়, তা কেউ জানে না। ভদ্রলোকের চারটে বন্দুক ছিল, আর বাক্সভরা টোটা। একটা হাঁক দিলে দু-দুটো ষণ্ডামার্কা চাষা, আলাদিনের দৈত্যের মত এসে হাজির হয়, তাদের চেহারা ত আপনি নিজেই দেখেছেন। আগেকার নায়েবের সংসার বেশ একটু বড়গোছের ছিল, অনেকগুলি ছেলেপুলে, চাকরদাসী। এতগুলো মানুষ মারা গেল, কিন্তু এ বাড়ীর বাইরে তা কেউ ঘুণাক্ষরে জানতে পারলে না। সকালে চাষার বৌ দুধ দুইতে এসে দেখে, আপনার

* ক্ষুদ্রকায় বন-দানব।

পেছনে জান্‌লাটার বাইরে যে একটু খোলা জমী, সেখানে নায়েব-পরিবারের অসাড় দেহ সারি-সারি সাজানো। সাজানোর কায়দাও অদ্ভুত! ভিজে ঘাসের ওপর রক্তমাখা মৃতদেহগুলো একটার পর একটা এমনভাবে রাখা হয়েছে যে স্পষ্ট অক্ষরে পড়া যায়—**TVRLAK.** নায়েব-পরিবারের ওপর তুর্‌লাকের রাগের কারণ আর কিছুই নয়, স্রুধু জঙ্গলের রাজ্যে তুর্‌লাকের আধিপত্যের ওপর হস্তক্ষেপ। ভদ্রলোক এ-অঞ্চলে আসার পর থেকেই নানা উপায়ে তুর্‌লাক্ তাঁকে জানিয়ে দেয়, এ-বনের রাজা সে নিজেই, কোনো জমীদার-হ্রারিয়ার * তার একাধিপত্যে হাত দেবার অধিকার নেই।

নায়েব-পরিবারের এই রহস্যময় হত্যাকাণ্ডের একটা মুখ্য কারণ ছিল, তা শুনলে আপনি হয়তো বেশ একটু আশ্চর্য হবেন। চাষারা বলে, তুর্‌লাক্ নাকি নিজেকে "বন-রক্ষক বলে' জাহির করতো। কোন কোন রাজাদের উপাধি যেমন "ধর্মরক্ষক", তুর্‌লাকের নিজের দেওয়া নামও তেমনি ছিল "বন-রক্ষক"। লেখাপড়া বিশেষ জানতো কিনা সন্দেহ, কিন্তু চ্যেহভের "বন-দানব" নাটক যা পরে "ভান্যা মামা"-রূপে বদল হয়ে ছাপা হয়, মনে আছে বোধ হয় আপনার, গাছপালার প্রাণ বাঁচাবার জন্যে ডাঃ আস্ত্রভের সে কী অদ্ভুত নিষ্ঠা!—যাক্ সে অন্য কথা, কিন্তু চ্যেহভের "বন-দানবের" খবর সে কোথায় পেলে কে জানে! অথচ এই দুই নাটকে চ্যেহফ্ মানুষের নিষ্ঠুর কুঠারাঘাত থেকে গাছপালার প্রাণ বাঁচাবার জন্যে যা-যা ব'লেছেন, তুর্‌লাক্ যেন একেবারে তার হুবহু প্রতীক। আমার পূর্বতনকে সে বারে বারে সাবধান করে' দিয়েছে, যেন তুর্‌লাকের বন-রাজত্বে একটি গাছের পাতা অবধি না ছেঁড়া হয়। কথাটা অবশ্য শুনতে ভারী সুন্দর। সত্যিই ত, এই যে লক্ষ-কোটি প্রাণী পৃথিবীর অঙ্কস্থল

* কাউন্ট।

ভেদ করে' আলো-হাওয়ার ভেতর জন্মলাভ ক'রেছে, এবং শত-শত বছর ধরে' ধরিত্রীর বক্ষমধু পান ক'রেছে, এদের কি পৃথিবীর কাছে কোনো দাবী নেই? আদিম মানুষ যে-অধিকারে বনের পশু শিকার করে, আকাশের পাখীকে তীরের আঘাতে ধরাশায়ী করে, জলের মাছ ডাঙ্গায় টেনে তোলে, সেই অধিকারে, প্রয়োজনের তাড়নায় মানুষ যদি গাছের গোড়ায় কুড়ুল চালাতো, তা হ'লে হয়তো তুর্‌লাকের বিশেষ আপত্তি হ'তো না। কিন্তু যখন দেখি, শতাব্দীবৃদ্ধ মহীরুহের শবদেহ কুঠারের লাঞ্ছনায় অবমানিত করে' পণ্যদ্রব্যরূপে মানুষ অন্য মানুষের কাছে পাঠাচ্ছে ভারে-ভারে কাতারে-কাতারে, এই যে নিহতের দেহাবশেষ নিয়ে বেচা-কেনা, যখন স্বচক্ষে দেখি, তখন মনে হয় তুর্‌লাক্ একজন মহাপুরুষ, উদ্ভিদের নির্বাক্ সুখ-দুঃখকে যে অমন আপন করে' নিতে পেরেছিল, তাকে খুন করে' আমি মহাপাতকের ভাগী হয়েছি। কিন্তু জমীদারবাবুরা ত সে-সব কথা শুনবেন না! আমার পূর্বতনও যে তুর্‌লাকের মত উদ্ভিদ্-জীবনের নিরাপত্তা সম্বন্ধে আকুতি অনুভব ক'রতেন না, একথা আমার বিশ্বাস হয় না। আপনারা হয়তো বুঝতে পারবেন না, বনে যারা কয়েক বছর বাস করে, তাদের কাছে প্রত্যেকটি চারা-গাছ পর্যন্ত কতদূর প্রিয়! কিন্তু তিনি ক'রবেন কী? হয় চাকরী, না হয় অনাহার! এই দুই অন্তিমের মাঝে মানুষ যখন দাঁড়ায়, তখন তাকে অনেক গর্হিত কাজই ক'রতে হয়, এ-ত জানা কথা! কিন্তু তুর্‌লাকের নৈতিকতা স্বার্থসিদ্ধির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না, তাই সে আমার পূর্বতনকে বারে বারে সতর্ক করে' যখন ফল পেলে না, তখন সে বিচার ও শাস্তি-বিধানের ভার নিজের হাতে নিলে, ছিন্নমূল গাছের মত সপরিবার নায়েবের দেহ মাটিতে লুটিয়ে রেখে গেল।

আমার পূর্বতন মারা যাবার অল্পদিন পরেই অন্য মহল থেকে বদলী করে' পান্ ত্রাবিয়া আমায় এখানে পাঠালেন। কাছারীতে যখন তাঁর

সঙ্গে দেখা ক'রতে যাই, তখন তিনিই আমাকে প্রথম তুর্লাকের কথা বলেন। তখন তুর্লাকের কার্যকলাপের বিবরণ শুনে আমি হেসে উঠেছিলাম। একটু দুঃখও হয়েছিল এই জন্যে যে, আগেকার কর্তা থাকলে তিনি নিজেই মহলে গিয়ে তুর্লাকের বাবাকে সায়েস্তা করে' দিয়ে আসতেন। পানিয়ে, তাঁরা সব অন্য ধরণের মানুষ ছিলেন! পরাধীন দেশের হ্বাবিয়া হওয়া সত্বেও কর্তা যখনই রুশী ৎসারের দরবারে যেতেন, তখন ৎসার সিংহাসন ছেড়ে নিজে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা ক'রতেন। কর্তার সে চোহারাই বা কী ছিল! যেন শ্বেতপাথরে খোদাই-করা এক বিরাট প্রতিমূর্তি। ধব্‌ধবে শাদা চুল, শাদা গোঁফ, লম্বা জোব্বা, কোমরে কোমর-বন্ধ। একজন মানুষে তাঁর খাপ-সুদ্ধ তরোয়ালখানা তুলতে পারতো না। সে-সব আর আজকাল নেই, আজকালকার হ্বাবিয়া-জমীদাররা সব পারী, অক্স্‌ফোর্ড, কেম্ব্রিজ-ফের্তা, বেশীরভাগ সময় কাটান বিদেশে, অনেকেই সুইস্‌দেশে, ফ্রাঁস বা আঙ্গ্‌লিয়াতে বাড়ী ঘরদোর ক'রেছেন, কেউ কেউ পোলভাষা পর্যন্ত ভুলে গেছেন। যাক্ সে অন্য কথা। পান্ হ্বাবিয়া আমায় তুর্লাক্ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান করে' দিলেন। হেসে বললাম, "পানিয়ে হ্বাবিয়, কর্তার হাতে-গরড়া নায়েব আমরা, বনে-জঙ্গলে সারাটা জীবন কাটালাম, আর এই বুড়ো বয়েসে একটা ডাকাতের হাতে প্রাণ দেবো, সে ভয় করি না।"

এখানে এসে যা দেখলাম তাতে মনে হ'লো, পান্ হ্বাবিয়ার কাছে যে-কথা জোর গলায় জাহির করে' এলাম, তা কাছারীর দারোয়ান-রক্ষী, পাইক্-বরকন্দাজ প্রহরিত আব্‌হাওয়ায় যেমন সহজ ও শোভন শোনালো, বনের অরক্ষিত বিস্তারের মাঝে তা তেমনি অসম্ভব ও হাস্যকর। হেই পানিয়ে! জঙ্গলের আইনে অধিকার বলে' যদি কিছু থাকে ত সে গায়ের জোর আর চাতুরী। এখানে এক অন্যকে গায়ের জোর

বা চাতুরী দিয়ে ধ্বংস করবার জন্যে দিনরাত ওৎ পেতে আছে, এবং আক্রান্ত জীব অহর্নিশি আত্মরক্ষায় ব্যস্ত।

পান্ নায়েব কিছুক্ষণের জন্য আপন কাহিনী বন্ধ করিয়া অগ্নি-কুণ্ডের সম্মুখের গুঁড়িটার উপর কাফির জন্য ছোট একটি কেৎলীতে জল চড়াইয়া দিলেন। পরে আবার তাঁহার গল্প সুরু করিলেন।

একদিন সন্ধ্যা হয় হয়, এমন সময়ে আমরা এখানে এসে পৌঁছলাম; ঐ ষণ্ডা-মার্কা চাষা দু'টো যারা আমাদের জামশচ্ থেকে ঘোড়ার গাড়ীতে করে' আনতে গিয়েছিল, তারা পথে একরকম জানিয়েই দিলে, যে এ মহলে নায়েব হয়ে আসা মানে মৃত্যুর কবলে আত্মসমর্পন করা। সঙ্গে আমার স্ত্রী আর দুটি মেয়ে। অমন স্পষ্টাস্পষ্টি ভাবে কথাটা শোনাতে তাদের অবস্থা কী রকম হ'তে পারে তা তো বুঝতেই পারছেন। সন্ধ্যার আবছায়ায় জঙ্গলটার ভেতর দিয়ে আসবার সময় কথাটা শুনে যে আমার মনও বিশেষ সুস্থির থাকতে পারলে, একথা ব'ললে মিথ্যে কথা বলা হবে। তবুও অন্ততঃ নিজের মনে একটু ভরসা আনবার জন্যে আমি বেশ একটু জোর গলায় হেসে উঠলাম। বনের ভেতর আমার হাসির প্রতিধ্বনি মিলিয়ে যাবার আগেই চোখের সামনে যে কাণ্ডটা ঘটলো তাতে বুঝলাম, আমার আততায়ী বড় সাধারণ মানুষ নয়। আঙুল দুই চওড়া আর বিঘৎ খানেক লম্বা, এক ঝলক বিদ্যুতের মত ঝক্‌ঝকে লক্‌লকে একখানা

ছুরীর মত কী একটা জিনিষ আমাদের মাথার ওপর দিয়ে সাঁ করে' ছুটে গেল। আমরা সবাই তার হাওয়া কেটে চলে' যাবার শব্দ স্পষ্ট শুনতে পেলাম। স্ত্রী আর মেয়েদের শান্ত করবার জন্যে তাদের শুনিয়ে চাষাদের জিজ্ঞেস ক'রলাম, "কী পাখী হে ওটা?" কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে তাদের তাড়াতাড়ি গাড়ী হাঁকাতে ইশারা ক'রলাম। জিনিষটা যে ছুরী ছাড়া আর কিছু নয়, সে-বিষয়ে আজ পর্যন্ত আমার কোনো সন্দেহ নেই।

সেই হ'লো তুর্লাকের কাছে আমার প্রথম অভ্যর্থনা। তারপর হপ্তা দুই একেবারে চুপ্‌চাপ্। সারাটা জীবন প্রায় বনে-জঙ্গলে কাটালাম, পানিয়ে, তুর্লাকের এ-চাল বুঝতে আমার বাকী রইল না। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, সে আমাকে আস্তে আস্তে নিশ্চিন্ত করে' ফেলতে চায়, তারপর ক্রমে যখন তার কথা ভুলে যাবো, সেই সময়ে একদিন সে হঠাৎ এসে হাজির হবে। অবশ্য তার চুপ্‌চাপ্ থাকার কারণ এও হ'তে পারে যে, সে হয়তো ভেবেছিল তার লক্‌লকে ছুরীর দৌড় দেখে আমি ভড়্‌কে যাবো, এবং হয় দু'একদিনের মধ্যেই এখান থেকে পালাবো, আর না হয় গাছ-পালা কাটা একেবারে বন্ধ করে' দেবো। যাই হোক্, তুর্লাক্ চুপ্‌চাপ্ থাকলেও, আমি সব দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখলাম।

প্রশে পানা, পালানো তামার কুষ্টিতে লেখে না। সুতরাং কয়েক দিনের মধ্যেই বেশ সংসার গুছিয়ে বসলাম। তবে মুস্কিল হ'লো গাছ কাটা নিয়ে। এখানে তুর্লাকের সঙ্গে আমার কোনো মতের অমিল নেই। তিরিশ বছর ধরে' হাজারে হাজারে গাছ নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তদ্বির করে' কাটিয়েছি! এক শ বছরের পুরাণো সস্‌না, দম্ব্ বা গ্রাবের গায়ে যখন কুড়ুলের প্রথম চোট্ লাগে তখন আমি আজও অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকি। নিজেকে নৃশংস ঘাতক বলে' মনে হয়; কুড়ুলের চোট্ লাগার সঙ্গে-সঙ্গে এক-একটা গাছ থেকে যেন ফিনকী দিয়ে রক্ত পড়ার মত হু-হু

করে' রস পড়ে, যেমন ধরুন ভূর্জ! গাছপালার যে মানুষের বা অন্য কোনো জীবের মত প্রাণ আছে স্থধু তাই নয়, তাদের যে জীবের মত চেতনা এবং বোধশক্তি আছে, এ কথা আমি লাল কালি দিয়ে লিখে দিতে পারি। কে একজন হিন্দুস্ এ নিয়ে গবেষণা ক'রেছেন, কাগজে প'ড়েছি। কিন্তু পানিয়ে, কথাটা এমন পরিস্কার যে তা নিয়ে কোনো পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণার দরকার আছে বলে' মনে হয় না। গাছের স্থধু চেতনা নয়, স্নেহবোধও আছে, এ আমি নিজে অনুভব ক'রেছি। আপনি যে-কোনো গাছকে সত্যিকার ভালোবাসা নিয়ে জড়িয়ে ধরে' দেখবেন, তার অধো-ঘুমন্ত চেতনায় একেবারে যেন স্নেহের বান ডেকেছে। তাকে চোখে না দেখলে বা কানে না শুনলেও, সে-স্নেহ সৃষ্টির এক আদিম উপায়ে, যেমন করে' আমরা অন্যের নির্বাক্ প্রেম বা ঘৃণা উপলব্ধি করি, সেই উপায়ে আপনার চেতনাকে স্পর্শ ক'রবে। গাছের ভাষা আছে, আপনি স্বীকার করেন? তার গোড়ায় কোপ মারলে, সে যে দস্তুরমত তার প্রাণরক্ষার জন্য অনুনয়-বিনয় করে, এ আমার চোখে দেখা জিনিষ, তা আপনারা বিশ্বাস করুন আর নাই করুন। যাক্ সে-সব অন্য কথা।

এখন মুস্কিল হ'লো এই যে, ঠিক যে-সময়ে আমি ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করে' তার উদ্ভিদ্ জীবনের প্রতি এই অদ্ভুত ভালোবাসা সম্বন্ধে দু'একটা তথ্য জেনে নেবো সঙ্কল্প করছি, ঠিক সেই সময়ে সদর থেকে গাছ কাটাবার তাগিদ এলো। মাসখানেকের মধ্যে গদ্যীনিয়া বন্দরে একখানা খালি জাহাজ পাওয়া যাচ্ছে, কোথায় সেই কোন্ মুল্লুক আর্জেন্তিনায় আমাদের দেশ থেকে কাঠ চালান যাবে, শ পাঁচেক গাছ চাই, দু'হপ্তার মেয়াদ, কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি-সর্ত সব সই করা হয়ে গেছে। এই মর্মে জামশচ্ থেকে চিঠি নিয়ে লোক এসে হাজির হ'লো। সেই দিনই ধারে-কাছে যত কাঠুরে পাওয়া গেল, তাদের খরব দিয়ে ডেকে পাঠালাম। পরের দিন সকাল থেকে বনে

যে সব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাছে আগে থেকেই কাটবার উপযোগী বলে' দাগ দেওয়া ছিল তাদের গোড়ায় কোপ প'ড়তে লাগলো। সারা দিন ধরে' সমস্ত বন জুড়ে গাছকাটার ধপ্‌-ধপ্‌ শব্দ। পানিয়ে, মনে হ'লো যেন পাগল হয়ে যাবো। থেকে থেকে এক-একবার বন কাঁপিয়ে একটা প্রকাণ্ড গাছ হুড়মুড়িয়ে শুয়ে প'ড়ছে, আবার সেই ধপ্‌-ধপ্‌। বনে তার প্রতিধ্বনি শুনলে হঠাৎ মনে হয় যেন সমগ্র বনভূমি প্রতি আঘাতে আর্তনাদ করে' উঠছে। নিজেকে অন্যমনস্ক রাখবার জন্যে ঘোড়ায় করে' নানা জায়গায় ঘুরি, কখনো কখনো কাঠুরেদের কাছে গিয়ে তাদের কাজের তদারক করি।

সেদিন গাছ কাটার তদ্বির ক'রতে ক'রতে জঙ্গলের ওদিকটায় যখন গিয়ে পৌছলাম তখন সূর্য্য অস্ত গিয়ে সন্ধ্যে হয়ে এলো। ওদিককার বনের পথ আমার একেবারেই জানা ছিল না। কাজেই ফেরবার সময় একটা কাঠুরেকে সঙ্গে নিয়ে আসতে হ'লো, এ-বনে একবার পথ হারালে অন্ততঃ সে-রাতে আর ফেরবার সম্ভাবনা নেই। সন্ধ্যে হবার কিছু পরেই ফিরতে ফিরতে ভাবছি, বাড়ীতে স্ত্রী আর মেয়েদের একলা রেখে এসে ভালো করি নি। এখন কাঠ কাটাবার সময়, চাষাদেরও নানা কাজে তদারক-তদ্বির করে' ফিরতে বেশ রাত হয়ে যাওয়া সম্ভব। তাছাড়া, তারা চীৎকার শুনে আসতে আসতে তুর্‌লাকের পক্ষে তার কাজ হাসিল করে' যাওয়া এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। এবং তুর্‌লাক্‌ যে দু'একদিনের মধ্যেই তার বন-প্রজাদের গায়ে হস্তক্ষেপ করার জন্যে কোনো একটা কঠোর প্রতিশোধ নেবেই, এ বিষয়ে আমি একেবারে নিঃসন্দেহ ছিলাম।

বাড়ী পৌছতে বেশ একটু রাত হয়ে গেল। বাড়ী পৌছে দেখলাম আমার স্ত্রী আর মেয়েরা থর্‌-থর্‌ করে' কাঁপছে। অনেকক্ষণ পরে একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে তারা যা বললে তাতে বোঝা গেল, এইবার তুর্‌লাকের সঙ্গে

আমার খোলাখুলিভাবে সংঘর্ষ সুরু হ'লো। শুনলাম, ঘণ্টাখানেক আগে, আমার আসতে দেরী হ'চ্ছে দেখে আমার স্ত্রী আর মেয়েরা যখন চিন্তিত হয়ে উঠেছে, তখন বাড়ীর কাছাকাছি শুক্‌নো পাতা মাড়ানোর শব্দ শোনা গেল। আমি আসছি মনে করে' ঝি দোর খুলে দিতে যাচ্ছে, এমন সময়ে দোরের ওপর পাঁচবার গুনে গুনে ঠক্ ঠক্ করে' কে আওয়াজ ক'রলে। ঝি কথাটি না বলে' তাড়াতাড়ি আলোটা নিবিয়ে দিয়ে স্ত্রীর কাছে ছুটে গিয়ে চুপি চুপি ব'ললে, আমি নই, অন্য কেউ। ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে চারজন মেয়েমানুষ থরথরিয়ে কাঁপছে, আর থেকে থেকে দোরের ওপর ঘা প'ড়ছে, ঠক্, ঠক্, ঠক্, ঠক্, ঠক্! আমার স্ত্রী বলেন, প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে' দরজার ওপর ঠক্-ঠক্ আওয়াজ শোনা গেল। শেষকালে ঘরের ভেতরকার অন্ধকার আর বাইরের ঠক্-ঠক্ আওয়াজ যখন অসহ্য হয়ে উঠলো তখন মরিয়া হয়ে আমার স্ত্রী জোর গলায় জিজ্ঞেস করলেন—"কে ও?"

শান্ত, সংযত স্বরে উত্তর এলো—"অমুক বাড়ী আছেন?"—অর্থাৎ আমি।

না, কাজে বেরিয়েছেন।

এত রাত্তিরে? হু। কাজের লোক, কাজে বেরিয়েছেন! অবশ্য যদি সত্যিই না বেরিয়ে থাকেন, আর যদি সত্যিই তিনি পুরুষ মানুষ হন্, ত একবার একটু বাইরে বেরিয়ে এলে ভালো হ'তো। তাঁর সঙ্গে আমারও একটু কাজ ছিল।

এখন বাড়ী নেই, কাল সকালে দেখা হ'তে পারে।

সকালে? সকালে, দিনের আলোয় কি সব কথা হয়? বলুন না, কষ্ট করে' একটু বেরিয়ে আসতে। এমন রাত্তিরটা একেবারে মাটি ক'রবো! দরজা ভেঙ্গে ঘরে ঢোকা কি ভদ্রতা হবে? তা ছাড়া সত্যিই

যদি বাড়ী না থাকেন ত একঘর মেয়েমানুষসুদ্ধু বাড়ীতে চড়াও হওয়া, সে একটা লজ্জার ব্যাপার হবে বুঝলেন না ?

না, সত্যিই তিনি বাড়ী নেই।

ঠিক ?

হ্যাঁ, সত্যি।

বেশ, তা হ'লে চললুম, আবার দেখা হবে।

কে তুমি ?

কে আমি ?!

খানিকক্ষণ কোনো উত্তর পাওয়া গেল না। তারপর কী এক অদ্ভুত স্বরে জবাব এলো—"ভুর্‌লাক্।" আমার স্ত্রী বলেন, সব কথাগুলোই তার সাধারণ মানুষের মত, এমন কি মনে হয় লোকটার স্বভাব ভারী মিষ্টি। কিন্তু "ভুরলাক্" কথাটা সে এমনভাবে উচ্চারণ করে যে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। ধপ্ করে' একটা আওয়াজ হ'লো। তরপর খস্-খস্ করে' শুক্‌নো পাতা মাড়ানোর শব্দ বনের ভেতর আস্তে আস্তে মিশিয়ে গেল।

অনেকক্ষণ যখন কোনো আওয়াজ পাওয়া গেল না, তখন ঝি এসে চাষাদের ডাকবার জন্যে যেম্‌নি দোর খুলেছে, অম্‌নি সে চীৎকার করে' মাটিতে অজ্ঞান হয়ে পড়লো। তাড়াতাড়ি স্ত্রী ছুটে এসে দেখেন, দরজার ওপর গেঁতা হাত দেড়েক একখানা কাফ্‌কাসী কিন্‌ঝাল্, * অন্ধকারে ঝক্-ঝক্ করছে। এর কিছু পরেই আমি এসে পড়ি।

জ্বলন্ত সস্‌নার গুঁড়ির ওপর কেৎলীতে কাফির জল ফুটিতে সুরু করিয়াছে। নায়েব পাশের আল্‌মারী খুলিয়া কাফির সরঞ্জাম বাহির

* কাফ্‌কাস্ বা ককেসাস্ দেশের ছোরা বিশেষ।

করিয়া টেবিলের উপর সাজাইতে লাগিলেন। দেখিলাম, এই বিজন বনভূমিতেও নায়েবের সংসারে নাগরিক জীবনের প্রত্যেকটি খুটিনাটি প্রয়োজনীয় সামগ্রী মজুত রহিয়াছে। এমন কি সুস্বাদু কাফি তৈরী করিবার স্পিরিট-ল্যাম্প্-সংযুক্ত কাচের কলটি পর্যন্ত বাদ যায় নাই। নিবিষ্টমনে কাফি তৈরী করিতে করিতে নায়েব কহিতে লাগিলেন—"প্রশেঁ পানা, এই নেশাটুকু আমি হাজার চেষ্টা করেও ছাড়তে পারি নি। এখানে মানুষ কী নিয়েই বা থাকতে পারে, বলুন। থিয়েটার নেই, লাইব্রেরী নেই, প্রতিবেশী নেই, এমন কি একটা পিয়ানো পর্যন্ত নেই। সারাটা দিন ধরে' টো টো করে' বনে বনে ঘোরো! সন্ধ্যেবেলা খাওয়া দাওয়া শেষ করে' স্ত্রী বোনার জিনিষ নিয়ে আর না হয় পেশেন্স্ সাজিয়ে বসেন, মেয়েরা বসে সুতো-তোলার কাজ নিয়ে। আর আমি আগুনটিতে আমার কেৎলীটি চাপিয়ে দিই। এই নিগ্রো-রঙের পেয়টি না পেলে, পানিয়ে, আমার রাতে ঘুম হয় না। অবশ্য কাফি তৈরী ক'রতে জানা চাই। খানিকটা গরম জলে কাফি ঢেলে দিলেই কি আর সে কাফি হ'লো? আপনার যদি না জানা থাকে ত কাফি তৈরী করবার কারসাজিটা আপনাকে বলে' দিই। হাতীঘোড়া কিছুই নয় পানিয়ে, সুধু একটি চিম্টি নূন আর এই এতটুকু ভানিল্লার গুঁড়ো! কাফি তৈরী করবার কল থাকলে ত কথাই নেই। আর তা না হ'লে নজর রাখতে হবে, যেন গুনে গুনে দুটিবার উঁৎলে ওঠার পর আর যেন এক সেকেণ্ড আগুনের ওপর না রাখা হয়। ব্যস্!"

দেখিলাম, কাফি তৈরী-করা শিল্পে নায়েবের দক্ষতা দম্ভোক্তিমাত্র নয়। কয়েক চুমুক পান করিয়াই স্বীকার করিতে হইল, অমন কাফি পূর্বে কখনো আস্বাদন করি নাই। কালো কাফির পেয়ালা হাতে লইয়া নায়েব পুনরায় তাঁহার গল্প সুরু করিলেন।

এইবার তুর্‌লাকের সঙ্গে আমার একরকম প্রকাশ্য বিরোধ বেঁধে গেল। তাকে ঠিক বিরোধ ব'ললে ভুল হবে। কারণ তুর্‌লাকের ওপর আমার কোনো বিদ্বেষ ছিল না, তার ওপর আমার বরং প্রচুর সহানুভূতি ও সমবেদনাই ছিল। কিন্তু তা তাকে দেখাবার সুযোগ ঘটে' উঠলো না। আর তুর্‌লাকের সঙ্গে দেখা হ'লে আমি তাকে কীই বা ব'লতাম? তার সঙ্গে বোঝা-পড়ার মুস্কিল ছিল এই যে, সে যা বিশ্বাস করতো তা প্রাণ দিয়ে, সমগ্র চৈতন্য দিয়ে বিশ্বাস করতো। আমি যে সখ করে, নির্যাতনের আমোদ উপভোগ করবার জন্যে গাছ কেটে বেড়াই না, এ যে আমার পেটের দায়ে ঘাতক-গিরি, তা তাকে বোঝাতে গেলে নিশ্চয়ই উত্তর পেতাম, কেন জগতে কি অন্য কোন কাজ নেই? আছে বৈকি। কিন্তু পঁচিশ বছর যে বনে-জঙ্গলে কাটিয়েছে, সমাজের তর্জনী-শাসন থেকে যে এই উদার অরণ্যের প্রসারতায় সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ ক'রেছে, তার পক্ষে ভারশৌএর ট্রামের ভিড়ে গাদাগাদি করে', কত অচ্ছুৎ-অস্পৃশ্য, দুশ্চরিত্র, রুগ্ন, কুৎসিত মানুষের সঙ্গে গা-ঘেঁসাঘেঁসি করে', আধুনিক জীবনযাত্রার অসাধু, অনৈতিক পূতিগন্ধ বরদাস্ত করে', দু'বেলা আফিস করা যে কতদূর অসাধ্য তা আপনি আমি হয়তো বুঝতে পারলাম। কিন্তু তুর্‌লাক্‌, যে জীবনে শহর এমন কি গণ্ডগ্রাম পর্যন্ত দেখেনি, এই বনভূমির মুক্ত অঙ্কস্থলে যার জন্ম ও লালন, শতায়ু সস্‌না, তপলা, এবং বছর-খানেকের শিশু অল্‌শীনা ও বন-মালীনা যার একান্নপরিবারভুক্ত, তার কাছে রুটি-জলের কোনো যুক্তিই যে খাটতো না, তা আমি আগে থেকেই জানতাম। তুর্‌লাক্‌ জংলী জানোয়ারের মত বেপরোয়া হয়ে আমায় আক্রমণ ক'রলে, এবং আমাকেও নিরুপায় হয়ে সে আক্রমণের প্রতিরোধ ক'রতে হ'লো।

যুদ্ধ যখন বেঁধে গেল, তখন প্রতিপক্ষকে সহানুভূতি দেখানো বা তার তরফের যুক্তি-তর্ককে বুঝতে যাওয়া যে আত্মরক্ষার সাপেক্ষ নয়, একথা ত

জানেনই। স্বতরাং হাজার অনিচ্ছা সত্বেও তার অত্যাচার যেমন বেড়ে চ'ললো, সেই অনুপাতে আমিও ক্রমে তার ঘোর শত্রু হয়ে দাঁড়ালাম। সে আমায় সপরিবারে হত্যা করবার জন্যে যে-সব চাতুরী অবলম্বন ক'রলে তাকে মারবার জন্যে, তার চেয়ে সূক্ষ্ম নানা রকম চালাকির আশ্রয় নিতে হ'লো। যুদ্ধ চ'ললো পাঁচ বছর। এই পাঁচ বছর কে হারবে, কে জিতবে, তার কোনোরকম স্থিরতা ছিল না। এই পাঁচ বছরের ঘটনা যদি শুনতে চান্, প্রশেঁ পানা, ত আরো দিনকতক থেকে যান্। আজ রাতও হ'লো অনেক, আর আপনিও সারাদিন পথ চলে' খুবই ক্লান্ত হয়ে প'ড়েছেন। সুধ্ একদিনের ঘটনা শুনলেই বুঝতে পারবেন, কী দুর্দ্ধর্ষ শত্রুর সঙ্গে আমায় পাঁচবছর ধরে' সমানে লড়তে হয়েছে।

বছরখানেক আগের কথা ব'লছি। একবার একটা কাজের জন্যে আমায় রাহদশ্ যেতে হয়। ফেরবার সময় খানিকটা মেঠো পথ পাওয়া গেল বটে, কিন্তু তার পরই জঙ্গল সুরু হ'লো, ঐ ওদিককার জঙ্গলটা। বনে ঢোকবার একটু পরেই দিনের শেষ আলোটুকু আস্তে আস্তে মুছে গেল। তখন গরমকাল, অন্ততঃ রাত দশটা পর্যন্ত গোধূলির আলো থাকে।* ভেবেছিলাম, কোনোরকমে আলো থাকতে থাকতে পৌঁছন যাবে। কিন্তু দেখা গেল, মেঠো পথের দূরত্বটা আমরা ঠিক অনুমান ক'রতে পারি নি। যাই হোক্, বনের মধ্যে হঠাৎ অন্ধকার ঘনিয়ে এলো। গাড়ীর সঙ্গে যে লণ্ঠনটা ছিল সেটা জ্বালিয়ে অনেক কষ্টে বড় বড় গাছের ফাঁকে ফাঁকে যা একটু পথের মত আছে, সেইখান দিয়ে আস্তে আস্তে আসছি।

ভাড়া-করা গাড়ী, রাহদশের কাছে মাঠ ধরে' যাচ্ছিল। আমায় দেখে গাড়ী থামিয়ে চাষা ব'ললে—"পানিয়ে, এই বন-জঙ্গলের পথে কোথায়

*ইউরোপের উত্তরাঞ্চলে গ্রীষ্মকালে বহুক্ষণ পর্যন্ত গোধূলির আলো পাওয়া যায়।

যাবেন একলা, আমাকে গোটা পাঁচেক জ্লতী* দিলে আপনাকে পৌঁছে দিয়ে আসি। আপনার ঘোড়াটাও একটু জিরোতে পার!" ভাবলাম, সত্যিই ত ঘোড়াটা আমায় পিঠে নিয়ে সারাদিন টো-টো করে' ঘুরেছে, আবার পাঁচ ক্রোশ পথ আমায় নিয়ে যদি যেতে হয় বেচারাকে তা হ'লে তার আর কিছু পদার্থ থাকবে না। তাছাড়া বন-জঙ্গলের পথ, একবার হারালে সে-রাতে বাড়ী পৌঁছবার আসা থাকবে না! চাষাকে জিজ্ঞেস ক'রলাম, সে আমার ঠিকানা চিনে যেতে পারবে কিনা। "পানিয়ে, এ অঞ্চলে পান্‌কে না চেনে কে?"—চাষা উত্তর দিলে। তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, বয়েস ষাটের নীচে নয়, লম্বা লম্বা পাকা দাড়ী, মাথায় একঝাঁকা পাকা চুল, কপালের ওপর হেমন্তের চষা জমীর মত গভীর বলিরেখা। অতদূর আত্মীয়তা দেখিয়ে সে যখন অমন আকিঞ্চন করে' আমায় পৌঁছে দিয়ে আসতে চাইলে তখন আমিও রাজী হয়ে গেলাম। তারপর চাষা ব'ললে—"পানিয়ে, এবছর যা অজন্মা, ঘরে একমুটো দানা নেই যে এই জানোয়ারটাকে খাওয়াই! বাবুদের দয়ায় এইরকম যা দু'এক পয়সা কামাই তাতেই কোনো রকমে সংসার চালাই।" দু'একটা কথাতেই বুড়োকে আমার ভারী ভালো লেগে গেল। চ'ললাম তার সঙ্গে। ঘোড়াটাকে গাড়ীর পেছনে বেঁধে দিলাম।

বনের মধ্যে লণ্ঠনের মিট্‌মিটে আলোতে চারপাশের হাত চার পাঁচ পর্যন্ত দেখা যায়। তারপর আলকাতরার মত কালো, গাঢ়, টল্‌টলে, চট্‌চটে অন্ধকার। হঠাৎ মনে হ'লো যেন কী একটা ভৌতিক উপায়ে আমরা মাটির নীচে কোন্ এক জিন্-এর রাজত্বে গাড়ী-ঘোড়া সবসুদ্ধ বন্দী হয়ে রয়েছি, আর আমাদের চারিপাশে আমি যে হাজার-হাজার গাছ কাটিয়ে তাদের মৃতদেহ জাহাজ ভরে' চালান দিয়েছি, তাদেরই প্রেতাত্মা

*২ জ্লতীতে এক টাকা।

আমাদের ঘিরে এক অদ্ভুত শব্দহীন অট্টহাস্যে আমাকে বিদ্রূপ ক'রছে। এরকম একটা সৃষ্টি-ছাড়া উপমা যে কেন মনে এলো, তা ভগবানই জানেন! কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে' চেষ্টা করেও আমি আমার মনের ভুলটা যে ভুলমাত্র, এই সামান্য কথাটাও উপলব্ধি ক'রতে পারলাম না।

হঠাৎ চমক ভাঙ্গার মত এতটা ভাব হ'লো। বুঝতে পারলাম, এতক্ষণ ধরে' ঢুলতে ঢুলতে কী একটা স্বপ্ন দেখছিলাম। চারিপাশে তাকিয়ে দেখলাম, আমরা ঠিক আগের মতই বড় বড় গাছের ফাঁকে ফাঁকে লণ্ঠনের মিট্‌মিটে আলোতে পথ খুঁজে খুঁজে আস্তে আস্তে চ'লেছি। চাষাটা ঠিক আগের মতই নিঃশব্দে গাড়ী হাঁকাচ্ছে, তবে কেন জানি না, সে এই গরমকালে যেন শীতে জড়োসড়ো হয়ে, গায়ে একটা কম্বল জড়িয়ে গুঁড়িশুঁড়ি হ'য়ে ব'সেছে। জিজ্ঞেস ক'রলাম—"কী হে, শীত ক'রছে নাকি?" সে যেন একটু থতমত খেয়ে উত্তর দিলে—"না, পানিয়ে তবে আমার বাতের ধাত কি না। রাত হ'লো অনেক, একটু একটু করে' শিশির প'ড়তে সুরু ক'রেছে, গায়ে কিছু চাপা না দিলে, পানিয়ে কাল আর উঠতে পারবো না।" অস্পষ্ট আলোতে তার পাকা চুল আর দাড়ী দেখে মনে মনে একটু হাসলাম, ভাবলাম শত্রুর আক্রমণের ভয়ে মানুষ নিজের ছায়াকেও সন্দেহ করে।

বাড়ী পৌছতে অনেক রাত হয়ে গেল। সারাদিন ধরে' ঘোরাঘুরি করার পর যেমনি ক্ষিধে তেমনি ঘুম পেয়েছে। মেয়েরা অনেকক্ষণ শুয়ে প'ড়েছে। সুধু স্ত্রী খাবার নিয়ে ব'সেছিলেন। খেয়ে নিয়ে, প্রশেঁ পানা, শোবার আগে আমার এই কাফিটুকু নিয়ে একটু ব'সেছি এমন সময় হাঁপাতে হাঁপাতে ঝি এসে চুপি চুপি ব'ললে—"প্রশেঁপানা, শিগ্‌গির শিগ্‌গির বন্দুকটা বার করুন, এসে প'ড়লো বলে'!" বন্দুকটা রাতে বরাবরই আমার শোবার ঘরে থাকে, সেটা হাতে নিয়ে ঝিকে জিজ্ঞেস

ক'রলাম, কী হয়েছে। উত্তরে যা শুনলাম তাতে আপনি অবাক্ হয়ে যাবেন।

ঝি ব'ললে, "প্রশেঁ পানা, বুড়োটাকে খাইয়ে দাইয়ে আমি আস্তাবলের ওপরে ছোট ঘরটায় তার শোবার জায়গা করে' দিয়ে এলুম। তারপর প্রশেঁ পানা, ঘরদোর সেরে আমি সদর দরজা বন্ধ ক'রতে যাবো, এমন সময়ে দেখলুম, যেন আস্তাবলের দিক থেকে মিট্‌মিট্ করে' একটু আলো আসছে। ভাবলুম, বলি, আবার গেল বছরের মত আগুন লাগবে? যাই বুড়োকে বলে' আসি যেন ওঘরে আলো না জ্বালে কিংবা সিগারেট না খায়। চারিদিকে কাট-কাটরা খড়, কাপড় তুলো এইসব, আগুনের একটি ফুল্‌কি কোনোরকমে যদি ছিট্‌কে পড়ে ত চোখের নিমিষে সব পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে আস্তাবলের ঘরে ঢুকতে যাবো এমন সময়ে কী মনে হ'লো, ভাবলুম, দেখি না, বুড়োটাকে এই শুইয়ে গেলুম, আর সে আলো জ্বেলে এত রাত্তিরে কী ক'রছে! বাইরের দিকে মই লাগানো ছিল। আস্তে আস্তে উঠে ফুটো দিয়ে দেখি, কোথায় বুড়ো! আমার দিকে পেছন করে' বসে' আছে দিব্যি ষণ্ডামার্কা এক জোয়ান, তার পাশে পড়ে' আছে শাদা পরচুলো আর দাড়ী। লোকটা আঙুল দিয়ে প্রকাণ্ড একখানা ছোরার ধার পরখ ক'রছে, আর বিড়বিড়িয়ে ছোরাটাকে কী ব'লছে! আমি ত প্রশেঁ পানা, উঠি কি পড়ি, সড়্-সড়্ করে' নেমে এসে দে ছুট! তবে তাড়াতাড়িতে নামতে গিয়ে মইখানা মাটিতে পড়ে' গেল। মইখানা পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই শুনতে পেলাম দুপ্‌দুপ্ করে' আস্তাবল ঘর থেকে ছুটে কে বাইয়ে লাফিয়ে প'ড়লো। মনে হ'লো আমায় তাড়া ক'রছে। প্রশেঁপানা, চট্ করে' আসুন, এক্ষুনি এসে প'ড়লো বলে'!"

কথাগুলো ঝি এক নিঃশ্বাসে বলে' গেল। তার কথা শেষ হবার

সঙ্গে-সঙ্গেই আমি যেখানে চাষার গাড়ীখানা রাখা হয়েছিল, সেইদিক লক্ষ্য করে' ছুটলাম। তার কাছাকাছি গিয়ে শুনতে পেলাম, রাতের বন কাঁপিয়ে খটাখট্ করে' ঘোড়া আর গাড়ীর শব্দ দূরে মিলিয়ে গেল! অত তাড়াতাড়ি পালানো যে তুর্‌লাক্ ছাড়া আর কারো ক্ষমতায় কুলোতো না, সে-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তবে আশ্চর্য এই যে, জঙ্গলের মধ্যে একলা পেয়ে, আমায় আধো ঘুমন্ত অবস্থাতে সে অনায়াসে খুন করতে পারতো, কিন্তু তা করে নি। তার কারণ আর কিছুই নয়, তার খেয়াল আমাকে সপরিবারে হত্যা না ক'রলে আমার ওপর ঠিক প্রতিশোধ নেওয়া হবে না। আরো মজা এই যে, আমায় আলাদা আর আমার স্ত্রী কন্যাদের আলাদা খুন করে' তার স্বস্তি হবে না। সেদিন এই সুযোগ সে পেয়েছিল অনেক বছর অপেক্ষা করার পর। কিন্তু কেন যে পালালো, তা জানিনা। হয়তো অতর্কিতে তার মতলবটা ফাঁস হয়ে যাওয়াতে, হঠাৎ তার মনের বল এমনভাবে ঝাঁকানি পেয়েছিল যে, তার আর লড়বার ক্ষমতা ছিল না। এও হতে পারে যে তার ছোরার সঙ্গে পরামর্শ করে' জান্‌তে পারে যে, সেদিন মারামারিতে তার পরাজয় সুনিশ্চিত, কারণ আমি সেদিন তাকে জন্মের মত খতম করবার জন্যে একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছিলাম।

সেইদিনই স্থির করলাম, তুর্‌লাক্‌কে শেষ না ক'রলে সে আবার কী ছলে এসে আমাদের শেষ করে যাবে। প্রশেঁ পানা, কাঁহাতক আর শত্রুর সঙ্গে লুকোচুরি খেলা যায়! তাছাড়া তার উৎপাত ক্রমে বেড়েই চললো। মাঠ থেকে আমার গরুগুলো একটা একটা করে' উধাও হ'তে লাগলো, আমার সখের বিশ্বস্ত ঘোড়াটাকে হঠাৎ একদিন পাওয়া গেল না, টম্‌টম্‌খানাকে ঠেঙিয়ে ভেঙ্গে রেখে গেল, কাঠুরেদের ঘর জ্বালিয়ে দিলে, আমার তাঁবের চাষাদের ক্ষেত খামার নষ্ট করে' তছ্‌নছ্ করে' দিয়ে গেল,

কাঠুরেদের সর্দারকে কচুকাটা করে' বাক্সে পুরে আমার দোর-গোড়ায় রেখে গেল। পুলিসে খবর দিলাম। কিন্তু পুলিসে ক'রবে কী? সরকার থেকে ঘোষণা ক'রলে, তুর্‌লাক্‌কে জীবিত বা মৃত অবস্থায় ধরে' এনে হাজির ক'রতে পারলে মোটা পুরস্কার পাওয়া যাবে। কিন্তু এ-অঞ্চলে কারো ঘাড়ে এমন মাথা নেই যে তুর্‌লাকের মাথাটি থালায় সাজিয়ে এনে থানার দারোগার সাম্‌নে ধরে' দেবে। শেষকালে ও-কাজটা আমাকেই ক'রতে হ'লো। অবশ্য ঠিক অক্ষরে অক্ষরে নয়।

তুর্‌লাকের ওপর মারাত্মকভাবে চটে' গেলাম একটা কারণে। ওদিককার বনটার ভেতর খানিকটা ফাঁকা জায়গা আছে, ঠিক আমাদের এই ফাঁকা জায়গাটার মত। সেখানে চালান দেবার জন্যে কাটা গাছ জমা হ'চ্ছিল। প্রশে পানা থাকে থাকে সাজানো গাছ এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো পর্যন্ত। প্রায় শ' পাঁচেক হবে। সেখানে অষ্টপ্রহর পাহারা রেখেছিলাম। কিন্তু কী এক অদ্ভুত উপায়ে শুক্‌নো খট্‌খটে গাছগুলোতে আগুন লেগে গেল। ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই সব গাছ পুড়ে ছাই হয়ে গেল। বাবুদের লোকসান ত হ'লোই, তাছাড়া আমার সবচেয়ে প্রিয় দারোয়ান, যে আমার সঙ্গে ছিল আজ প্রায় বিশ বছর, সে জীবন্ত পুড়ে ম'রলো। সে কী নিষ্ঠুর দৃশ্য! একটা শুক্‌নো গাছের সঙ্গে তাকে শক্ত করে' বেঁধেছে। তার চারিদিকে জাফ্রান রঙের আগুনের শিখা। আমাকে দেখে তাকে বাঁচাবার জন্যে সে কি করুণ মিনতি! ধারে-কাছে এক ফোঁটা জল নেই, আর অতগুলো জ্বলন্ত গাছ ডিঙ্গিয়ে তার কাছে যাওয়াও অসম্ভব। আমরা কান্না চেপে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইলাম। চোখের নিমেষে সে হু-হু করে' পুড়ে শেষ হয়ে গেল, যেন একগাছা শণের দড়ি।

গায়দা পুড়ে মরবার পর আমি আর স্থির থাকতে পারলাম না।

হুকুম দিলাম, বনে যত গাছে দাগ দেওয়া আছে, সব কেটে লোপাট ক'রতে। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত চললো দুই মানুষের দ্বন্দ্বে নিরীহ বনস্পতিদের ওপর নৃশংস কুঠারাঘাত। আবার বন কাঁপিয়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহীরুহের দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, ভাঙ্গে কত পাখীর বাসা, বরূফ্‌কি আর বন-মালীনার গাছ পিষে যায়, ত্রস্ত জন্তুরা বন ছেড়ে পালায়। সে এক বীভৎস দৃশ্য! কিন্তু এ ছাড়া আর গতি ছিল না। ঠিক জানতাম, তুর্‌লাকের বন-রাজ্যের প্রজাদের ওপর অত্যাচার সে বেশী দিন সইতে পারবে না, আমার ওপর প্রতিশোধ নেবার জন্যে তার গহন বন-প্রাসাদ ছেড়ে হন্যে হয়ে বেরিয়ে আসবে।

একদিন সন্ধ্যের একটু আগে আমি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে বন কাটাচ্ছি। এই কিছুদিন আগেকার কথা। গ্রীষ্মের তামাটে আকাশ ভেঙ্গে সেদিন প্রথম হেমন্তের বৃষ্টি সুরু হ'লো। প্রায় ছ' মাস ধরে' অনাবৃষ্টি। মাটি ফেটে চৌচির হয়ে গেছে। সমগ্র বনভূমি এক বিন্দু জলের জন্যে উন্মুখ হয়ে ছিল। প্রথম বৃষ্টির জল পেয়ে গাছ-পালার সে কী আনন্দ! আমার সঙ্গে উদ্ভিদের, প্রশেঁপানা, কী এক অদ্ভুত যোগ আছে, তা জন্মগতও হ'তে পারে, কিংবা গাছ-পালার সঙ্গে বহুকাল সহবাসের জন্যেও হ'তে পারে। সেদিন দাঁড়িয়ে ভাবছি, এই যে আমার জীবনের দ্বন্দ্ব, একদিকে শত-সহস্র উদ্ভিদের প্রতি আমার গভীর ভালবাসা, এই যে সস্‌না, তপলা, গ্রাব্‌, দম্ব্‌, অল্‌শীনা, বন-মালীনার সঙ্গে আমার নিকট আত্মীয়তা, আর অপর দিকে পেটের ওজরে ক্ষণে ক্ষণে মুহূর্তে মুহূর্তে স্বজাতি-হত্যা, এই দ্বন্দ্বের কি কোন দিন অবসান হবে? এমন সময়ে একজন কাঠুরে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো—"পানিয়ে সাবধান!" তার কথা শেষ হবার আগেই একখানা ছুরী আমার এই বাঁ হাতের ওপর এসে বিঁধলো। ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত ছুটলো। সঙ্গে-সঙ্গে দেখলাম, একটু

দূরে আগাছার বন তোলপাড় করে' যেন একটা বনবরাহ ছুটে চলেছে। তার গতি লক্ষ্য করে' গুলি ছুঁড়লাম। বয়েস কম হয়নি, কিন্তু আমার হাতের গুলি যেন শিকারকে নিজে খুঁজে বার করে। দেখলাম, একটু পরেই আগাছাগুলো স্থির হয়ে গেল।

তুর্লাক্‌কে স্বচক্ষে দেখলাম সেইদিন প্রথম ও শেষ বার। সবুজ বনভূমির কোলে যেন কোন্ বন-দেবতার অপার্থিব মূর্তি। মানুষ যে অমন নিখুঁত সুন্দর হ'তে পারে, তা আমি কল্পনাও ক'রতে পারিনি। বয়েস তিরিশের বেশী হবে না, কিন্তু তার চেহারায় সে কি অলৌকিক প্রসাদ, কি নিবিষ্ট আত্মসংযম! যেখানে সে শুয়ে ছিল, সেইখানেই তাকে মাটি চাপা দেবার ব্যবস্থা করে' বাড়ী ফিরলাম।

তুর্লাক্‌কে খুন করে' আমার মনের অবস্থা কেমন হ'লো, যদি জিজ্ঞেস করেন, ত আমাকে স্বীকার ক'রতেই হবে যে, পাঁচ বছর ধরে' ক্রমাগত এক অদৃশ্য চতুর শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে' সত্যিই আমার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটেছিল। তা ছাড়া যে-কোনো প্রাণী যখন দেখে তার নিজের গায়ের রক্ত ফিন্‌কি দিয়ে মাটিতে প'ড়ছে তখন তার খুন চেপে যায়। সুতরাং যখন দেখলাম রক্তে তুর্লাকের বুক ভেসে গেছে, তখন মনে মনে ভারী একটা সন্তোষ অনুভব ক'রলাম।

ভেবেছিলাম, তুর্লাক্‌কে মেরে এতদিন পরে বেশ একটু শান্তি উপভোগ করা যাবে। কিন্তু আবার এক নতুন অশান্তি সুরু হ'লো। এই বন-দেবতাই বলুন আর অতি-মানুষ বা প্রতিভাই বলুন, এর জন্ম যে এক কুৎসিত, বিকলাঙ্গ, পাগলী চাষীর গর্ভে, হয়তো কোন্ ইন্দ্রিয়-ক্ষুধায় মত্ত সম্ভ্রান্ত পথিকের ক্ষণিক সহবাসে, তা কেউ জানতো না। তুর্লাক্ মারা যাওয়ার পর তার পাগলী মা'টা বনে বনে কেঁদে বেড়াতে আরম্ভ ক'রলে। সে যেন মানুষের কান্না নয়। হেমন্তের সন্ধ্যায় বৃষ্টি-

ভেজা ঝড় জঙ্গলের ভেতর যেমন বিকট কান্নার রোল তোলে, এ যেন তাই। এক-একবার গভীর রাতে অন্ধকারে আমার জান্‌লার বাইরে এসে দাঁড়ায়। বোবা, কালা, হাউ হাউ করে' কী ব'লতে যায়, ব'লতে পারে না। আবার কাঁদতে কাঁদতে বনের দিকে চলে' যায়। ঝড়-বৃষ্টি ছাপিয়ে সে কান্নার হাহাকার মানুষকে পাগল করে' দেয়, প্রশেঁ পানা। দেখি, আর কতদিন এমনভাবে চলে। পরে একটা বিলি-ব্যবস্থা ক'রতেই হবে। আমার নিজের, স্ত্রীর আর মেয়েদের যা মনের অবস্থা হয়েছে, তাতে বেশীদিন এ-অঞ্চলে থাকা চ'লবে না। বাবুদের বলে' অন্য মহলে বদলী হয়ে যাবো, ভাবছি। ওঃ, তিনটে বেজে গেছে! আপনাকে এই ছাইভস্ম গল্প বলে' এতক্ষণ জাগিয়ে রাখলাম! আপনি অতিথি, আমার পক্ষে ভারী অভদ্রতা হয়েছে। যত দোষ এই কালো কাফিটুকুর! শিক্ষিত মানুষের সঙ্গ পাই না, একলা-একলা আগুনের ধারটিতে বসে' পেয়ালার পর পেয়ালা নিগ্রো রঙের কাফি ঢালি আর খাই। কত কথাই মনে হয়, সব কথা ত সবাই বুঝতে পারে না, আর নিজেকে সব কথা শোনাতে গেলে ভয় হয়, হঠাৎ একদিন হয়তো বিড় বিড় করে' নিজের মনে ব'কতে সুরু ক'রবো। এই কাফিটুকুর নেশা না থাকলে, প্রশেঁ পানা, কোন কালে শুতে যাওয়া যেত! তাছাড়া আপনি যখন কাল যাবেনই, তখন অন্ততঃ মাস ছয়েকের মত গল্প করার সাধ এক রাত্রেই মিটিয়ে নেওয়া গেল।

পরের দিন রাহদশ্‌ পর্যন্ত যাইবার জন্য নায়েব জোর করিয়া তাঁহার টম্‌টম্‌ গছাইয়া দিলেন, এবং বনে প্রবেশ করা পর্যন্ত যতদূর দেখা যায় আমার দিকে তাকাইয়া মাঝে মাঝে হাত নাড়িয়া বিদায় জানাইলেন।

সারা রাত বৃষ্টি পড়িয়া সমস্ত বনভূমি ধুইয়া মুছিয়া সাফ্‌ করিয়া দিয়াছে। পোলদেশের সোনার হেমন্ত গাছে-গাছে যেন আগুন লাগাইয়াছে। ঐ সামান্য একটু খোলা মাঠের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা তপলার পত্রমর্মরের নীচে নায়েব-কুঠী বনের আড়ালে ধীরে ধীরে আত্মগোপন করিল।

কলিকাতা,
১৮ই বৈশাখ, ১৩৪৮

বিগস্

শ্রীমৎ অমুকানন্দ স্বামী যখন ভারতবর্ষের কোন্ এক মহাপীঠস্থানে প্রাচীন আর্য-দেবতা মিত্রের মন্দির স্থাপনের জন্য দেশে-বিদেশে চেক্ সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতেছিলেন, ঘটনাটা সেই সময়কার। একদিন লিস্‌বনের একটা নামজাদা পান্থশালার শয়নকক্ষ-সংলগ্ন স্নানাগারে অর্গল-বদ্ধ অবস্থায় স্বামীজী কামধেনু আকারের পঞ্চধাতু নির্মিত জিভ-ছোলার সাহায্যে সশব্দে রসনা-মার্জনে ব্যাপৃত, এমন সময়ে বাদাম-চেরা চোখে হাসির ঝলক্ লাগাইয়া পর্তুগালী পরিচারিকা টেবিলের উপর এক গোছা চিঠি রাখিয়া স্নানাগারের দরজায় মৃদু আঘাত করিয়া জানাইয়া গেল—"পস্তা সেঞর।" উত্তেজনায় একরকম মূল্য ধরিয়া দেওয়া গোছের স্নান সারিয়া, স্বামীজী যথারীতি বোতল হইতে ছিপি দিয়া হোমিওপ্যাথী ঔষধ ঢালিবার মত করিয়া একবিন্দু "সিন্ধু"-বারির সাহায্যে সংস্পর্শদুষ্ট কাফি, রুটি, মাখন এবং আরো কী কী প্রাতরাশের উপকরণগুলিকে পবিত্র করিয়া লইয়া, দক্ষিণ হস্তে মুখে পূরিতে পূরিতে বাম হাত দিয়া চিঠিগুলা উলটাইয়া পালটাইয়া পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। মিত্রধর্মপ্রচারক

অমুকানন্দ স্বামীর স-দস্তখৎ ফটো-পট প্রকাশ করে নাই, ইউরোপের যে-কোনো দেশে যে-কোনো ভাষায় এমন কোনো সচিত্র সাপ্তাহিক বা মাসিক আছে কিনা সন্দেহ। তাছাড়া প্রায় সকল ভাষাতেই মিত্রধর্ম্মের বিবরণ ও তাহার বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ-পরিপূর্ণ পুস্তিকা মুদ্রিত করিয়া সদস্য হইবার নিয়মাবলী ও ফরম্ সমেত তাহা ইউরোপের সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের ঠিকানায় স্বামীজী ইহার আগেই চিঠি-বাক্স-সাৎ করিয়াছেন। স্বামীজীর উত্তেজনার কারণ সম্বন্ধে পাছে কেহ অযথা সন্দেহ পোষণ করেন, সেইজন্য এই অবান্তর কথাকয়টি লিপিবদ্ধ করিলাম। ফলকথা, বহুদিন ধরিয়া তিনি মিত্র-দেবের একটি শাঁসালো ইউরোপীয় সম্ভ্রান্ত ভক্তের আবির্ভাবের আশায় বসিয়া আছেন।

সেদিনকার চিঠিগুলাতেও আন্তরিক ধন্যবাদ ও সাহায্যদানে অসামর্থ্য-জ্ঞাপন ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তবে শেষকালে পড়িবার জন্য যে চিঠিখানি স্বামীজী একপাশে সরাইয়া রাখিয়াছিলেন, সেইখানা দেখিয়া স্বামীজীর মনে হইল, মিত্রদেব বুঝি এতদিন পরে তাঁহার সেবায়তের দিকে মুখ তুলিয়া চাহিলেন। চিঠিখানার ওজন ন্যূনকল্পে আধপোয়া হইবে। পাতার পর পাতা প্রেরণা-পরিপূর্ণ, দর্শন ও কাব্য মিশ্রিত, সালঙ্কার-ইংরেজী বাক্যবিন্যাসের গোলোকধাঁধাঁর অলিতে গলিতে মাথা ঠুকিয়া যখন স্বামীজী কোনো রকমে বাহির হইয়া আসিলেন, তখন তিনি তাহার যে সারমর্ম্ম গ্রহণ করিলেন, তাহা শাদা কথায় এই: আর্যভূমিতে "মিত্রা-দেওয়ার" পুনরাবির্ভাবে হ্রাবিয়া * হরেঙ্কো অতিশয় আনন্দিত হইয়াছেন। একমাত্র মিত্রা-দেওয়াই যে বর্তমান হিংসা-বিধ্বস্ত সংসারে মৈত্রী স্থাপন করিবে, সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। মিত্রা-দেওয়ার মন্দির প্রতিষ্ঠা কল্পে তিনি যৎসামান্য লাখ কয়েক টাকা দিতে চান। তবে সে সম্বন্ধে তিনি স্বামীজীর

* কাউণ্ট

সহিত সাক্ষাতে বিশদ আলোচনা করিতে ইচ্ছুক। সুতরাং কালবিলম্ব না করিয়া স্বামীজী যদি তাঁহার জায়গীরে তাঁহাকে দর্শনদানে অনুগৃহীত করেন ত তিনি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিবেন।

স্বামীজী আশা করিয়াছিলেন, নিমন্ত্রণপত্র-সংলগ্ন ভাড়া ও রাহাখরচ বাবদ বেশ মোটা রকমের একখানা চেক্ থাকিবে। কিন্তু চিঠির প্রত্যেক-খানি পাতা পুনঃপুনঃ পরীক্ষা করিয়াও চেকের উপস্থিতিব্যঞ্জক একটি আল্‌পিনের ছিদ্র পর্য্যন্ত আবিষ্কার করিতে না পারিয়া তিনি একটু চিন্তিত হইয়া পড়িলেন। পথ কম নয়। লিস্‌বন্ হইতে ইস্পানিয়া, ফ্রান্স্, বেল্‌জিয়া, আল্‌মানিয়া পার হইয়া তবে পোলদেশ। তাহার পর ভারশৌ হইতে ট্রেনে করিয়া পোলদেশের উত্তরপূর্ব্ব অঞ্চলে হ্রাবিয়ার জায়গীরে পৌছিতে প্রায় ঘণ্টা দশেক লাগিবে। টমাস্ কুকের টহল-বুরো হইতে স্বামীজী এই তথ্য সংগ্রহ করিলেন। তাছাড়া পথে অন্ততঃ চার বার গাড়ী বদল করিতে হইবে, এবং পথশ্রান্তি দূর করিবার জন্য পান্থশালায় রাত্রিযাপন করিতে হইবে। তত্রাচ মিত্রদেবকে স্মরণ করিয়া স্বামীজী পরের দিনই সুদূর, অজ্ঞাত পোলদেশ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ইহার সপ্তাহখানেক পরে একদিন বিকালের দিকে সূর্যমুখী রঙের রেশমী পাগড়ী ও মোটা পশমের জোব্বার বর্ণচ্ছটায় দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া ও স্থানীয় অধিবাসিদের চোখে ধাঁধা লাগাইয়া, স্বামীজী হ্রাবিয়ার জায়-গীরের নিকটবর্তী স্টেশনে অবতরণ করিলেন। তাঁহার যথোচিত অভ্যর্থনার জন্য স্বয়ং হ্রাবিয়া আপন অশ্বিনীকুমারদ্বয়-বিনিন্দিত, রূপার সাজ পরানো শাদা ঘোড়া ও আব্‌লুশ্-কালো জুড়ী লইয়া উপস্থিত ছিলেন। ঘোড়ার গলায় বাঁধা ঘুঙুরের বাজনায় পথ-চলা কিষাণ-কিষাণীদের সন্ত্রস্ত করিয়া যখন তাঁহারা হ্রাবিয়ার প্রাসাদে পৌছিলেন, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া গেছে।

অন্ধকারে হ্রাবিয়ার প্রাসাদের, কেল্লার মত জায়গায় জায়গায় খোবরাল ছাদ, ও ঘড়িওয়ালা মিনারের যেটুকু চোখে পড়িল, তাহা দেখিয়া শ্রীমৎ অমুকানন্দ স্বামী বারে বারে মিত্রদেবের উদ্দেশে প্রণাম জানাইলেন। হ্রাবিয়া হরেস্কোর প্রসাদে যে মিত্রমন্দিরের স্বর্ণচূড়া আকাশ ভেদ করিয়া স্বয়ং সবিতাদিত্যের হিরণ্ময় পাত্রাবরণকে ম্লান করিয়া দিবে, সে-বিষয়ে স্বামীজীর সন্দেহ রহিল না।

গাড়ী প্রাসাদ-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে না করিতেই ডজনখানেক চাপরাসি-বাট্‌লার ও দাস-দাসী তাঁহাকে ঘেরিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার হাতের হস্তিদন্ত-নির্মিত, মুক্তা-খচিত পরিব্রাজকের যষ্টি ও মৃগচর্মের হাত-ব্যাগটি একপ্রকার ছিনাইয়া লইল। তাহার পর বাথ-টবে স্নিগ্ধ, সুবাসিত নকল সমুদ্রের জলে স্নানান্তে পথশ্রান্তি দূর করিয়া স্বামীজী হ্রাবিয়ার সহিত দর্পণ বিচ্ছুরিত সারি-সারি ঝাড় লণ্ঠনের তীব্র আলোকে উজ্জ্বলিত অশনকক্ষে প্রবেশ করিলেন।

এতক্ষণ পরে সুস্থির লইয়া হ্রাবিয়ার সহিত মুখোমুখি বসিবার সুযোগ ঘটিল। বয়স তাঁহার ষাট পার হইয়াছে, মাথাভরা ধবধবে শাদা চুল, প্রাচীন রোমক পণ্ডিতের মত তীক্ষ্ণ নাসিকা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ওষ্ঠাধর, বড় বড় শাদা গোঁফ বংশপরম্পরায় আধিপত্য-গৌরবের পরিচয় দেয়। কালো চোখ দুইটার অসাধারণ জ্যোতি দেখিয়া তাঁহাকে হঠাৎ বৈদিক যুগের তপঃক্লিষ্ট ব্রাহ্মণ বলিয়া ভুল হইতে পারে। কিন্তু কিছুক্ষণ আলাপের পরই তাঁহার বাহ্যিক ও উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত আভিজাত্যের কঠোর আবরণ ভেদ করিয়া ভিতরের সহজ ও সরল প্রকৃতির মানুষটি ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসে। তখন তাঁহার উদ্দীপ্ত চোখে শিশুর হাসি ভরিয়া ওঠে, এবং মসৃণ গণ্ডস্থলে একটি গভীর ও প্রীতিকর সিনিকতার রেখাপাত হয়।

আহার্যের প্রতীক্ষা করিতে করিতে লম্বা তুর্কী সিগারেট সমেত কুল-চিহ্ন-খচিত রূপার বাক্সটি স্বামীজীর দিকে আগাইয়া ধরিয়া, তাঁহার আত্মম্ভরি প্রত্যাখ্যান একপ্রকার লক্ষ্য না করিয়াই তিনি নিজে একটি সিগারেট ধরাইলেন, ও পরে সবিস্তারে আত্ম-পরিচয় সুরু করিলেন।

দেখুন মস্তো স্বামী, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবার জন্যেই বিশেষ করে' আমার জায়গীরে আহ্বান করি। আমাকে দেখে কি হঠাৎ হিন্দুস্ বলে' ভুল হয়? দেখুন ত ভালো করে' তাকিয়ে আমার মুখের দিকে। হয়, তো? দেখুন, ঠিক যা ভেবেছিলাম তাই। আপনি শুনলে আশ্চর্য হবেন, মস্তো স্বামী, আমি জাতিতে হিন্দুস! আপনি কি পোল-কবি মিৎস্ক্যেভিচ-এর মহাকাব্য "পান্ তাদেউশ্" প'ড়েছেন? পড়েন নি? কেন? আশ্চর্য! এখনও অতবড় মহাকাব্যের ইংরেজী বা ফরাসী তর্জমা হয় নি! বলেন কী! যাই-হোক্, "পান্ তাদেউশ্"এ আমার সামান্য বংশ-পরিচয় পাওয়া যায়। আমারই প্র-প্রপিতামহ হ্রাবিয়া হরেঙ্কোর চরিত্র-বিবরণ "পান্ তাদেউশ"-এর পাতায় পাতায়। যদি কখনো পড়েন, ত দেখতে পাবেন, তাঁর চরিত্রের আধ্যাত্মিক সম্পদ। তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল সৌন্দর্য্যের সেবা। থেকে থেকে আচম্বিতে তাঁর সৌন্দর্য্যবোধ তাঁকে বিহ্বল করে' ফেলতো! অতীন্দ্রিয়ের সঙ্গে তাঁর এক অদ্ভুত অলৌকিক যোগ ছিল যা ক্ষণে ক্ষণে নিবিড়, অনির্বচনীয় আনন্দে আত্মপ্রকাশ ক'রতো। হ্রাবিয়া হঠাৎ অতি সাধারণ কোনো জায়গা দিয়ে ঘোড়ায় চড়ে চ'লতে চ'লতে কী এক অজানা কাব্যলোকের

ভেতরে গিয়ে হাজির হ'তেন। "পান তাদেউশ"-এ তাঁর এই অতীন্দ্রিয় আনন্দ-বোধের বিবরণ প'ড়তে প'ড়তে, কয়েক বছর আগে একদিন ভাবছি, তাঁর এই ঐশ্বরিক শক্তি, যার সামান্য অংশ আমি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি, তা এলো কোথা থেকে! হঠাৎ উপলব্ধি ক'রলাম, তাঁর রক্তে এবং আমার রক্তে এমন বীজ আছে, যা যুগ যুগ ধরে' আনন্দের স্বরূপে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করে' এসেছে। সে বীজ, অন্ততঃ আপনি নিশ্চয় স্বীকার ক'রবেন, মস্যো স্বামী, ইউরোপের অনুর্বর, অনাধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে জন্মলাভ করে নি।

এর কিছুদিন পরে ইতিহাস ও ভাষাতত্ব নিয়ে একটু নাড়াচাড়া ক'রতেই ব্যাপারটা আমার কাছে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হ'লো। এখানেই বলে' রাখা ভালো যে, আমাদের বংশ পোলদেশে বহু শতাব্দী ধরে' বসবাস ক'রলেও আমাদের উৎপত্তি লিতুয়ানিয়ায়, এবং বরাবরই আমাদের বিবাহাদি লিতুয়ানীয়দের সঙ্গে হয়ে আসছে। আমাদের অবশ্য এ-দেশে লিতুয়ানীয় বলে না, বলে জ্মুজিন্। আমাদের সম্বন্ধে একটা কথা আবিষ্কার করলাম, তা এই যে, আমরা এই অল্পসংখ্যক জ্‌মুজিন্‌রা, কোন এক প্রাচ্য দেশ থেকে এসেছি। প্রাচ্য মানে, চীন থেকেও নয়, জাপান থেকেও নয়, আরব, ইরাণ বা তুরাণ-দেশ থেকেও নয়। আমাদের উৎপত্তি ভারতবর্ষে। তার প্রমাণ পাবেন, আমাদের কালো চোখে আর আমাদের ভাষায়। আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে, ইউরোপীয় আর্যভাষাসমূহের মধ্যে সাঁস্‌কৃতার সঙ্গে নিকটতম সম্বন্ধ হ'চ্ছে লিতুয়ানীয়ের, এবং আমার মনে হয় জ্‌মুজিন্‌দের ভাষার।

এই গেল এক কথা। দ্বিতীয়তঃ, আমরা যদি পোল হই, তা হ'লেও আপনাদের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ খুব দূরের নয়। পোল ও অন্যান্য স্লাভ ভাষার সঙ্গে সাঁস্‌কৃতার যোগ দেখলে আশ্চর্য হ'তে হয়। এ আমি একটি

প্রাচ্য ভাষায় পণ্ডিত অধ্যাপকের কাছে শুনেছি। শুনেছি, নাকি আপনাদের দেশে ব্রাহ্মণরা নিজেদের শর্মা বলে' অভিহিত করেন। আর জানেন, পোলদেশের প্রাচীন নাম কী ছিল? সার্মাতিয়া! এই শর্মা ও সার্মাতীয়দের মধ্যে প্রাচীন আত্মীয়তা কী ছিল, তা একদিন ইতিহাস অতীতের কবল থেকে উদ্ধার ক'রবে, আপনি দেখে নেবেন, মস্তো স্বামী।

তৃতীয়তঃ, রক্ত যে সুধু লাল ও শাদা রঙের অণুতনুর সমষ্টি, একথা আমি মানি না। আমার বিশ্বাস, আমাদের জড়দেহের শিরা-উপশিরার সঙ্গে এক সূক্ষ্ম আধ্যাত্মিক দেহের শিরাউপশিরা অদ্ভুত উপায়ে জড়িত। দৈহিক রক্তের মত আমাদের আধ্যাত্মিক রক্তও এই সূক্ষ্মশরীরের ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত। আমার প্র-প্রপিতামহের শরীরে, আমার বিশ্বাস, হিন্দুস্তানের আধ্যাত্মিক রক্ত প্রবাহিত ছিল, এবং সে রক্ত আমি আমার দেহমনের প্রতি অংশে অনুভব করি। এই দেখুন না কেন, যেমনি আপনার মিথ্রা-ধর্ম সম্বন্ধীয় পুস্তিকা হাতে এলো, অমনি আমার প্রাণ সাড়া দিয়ে উঠলো। ভাবলাম, ইউরোপের সভ্যতায় আজ সর্ববিষয়ে এই যে অসঙ্গতি পদে পদে, এর মূলে তার ঘাড়ে চাপানো, বিদেশী, বিজাতীয়, না-আর্য, ইহুদী ধর্ম, যা তার কাছে আজও দুর্বোধ্য, এবং যার আদর্শের সঙ্গে তার অন্তরের, তার রক্তের কোন যোগ নেই। আমাদের প্রাচীন আর্য-ধর্ম, যা আপনার মত মনীষীরা পুনর্জীবিত ক'রতে চেষ্টা ক'রছেন, চতুর্মুখ "শ্ব্যাতভিদ্‌" বা বিশ্বদর্শী,* আগ্নি বারুণা, মিথা প্রভৃতি দেবতার অর্চনা যে-দিন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হবে, সেই দিনই ইউরোপ সত্যিকার আধ্যাত্মিক মুক্তিলাভ ক'রবে। হিন্দুস্তানের নূতন মহাপীঠস্থান মিথ্রাপুরে মিথ্রা-মন্দির স্থাপনা সম্বন্ধে আলোচনা পরে বিস্তারিতভাবে করা যাবে।

* পোলদেশে প্রাপ্ত প্রাচীন স্লাভদের দেব-মূর্তি।

মন্দির-প্রতিষ্ঠাকল্পে কয়েক লাখ জ্লতী * দেবার ইচ্ছে আছে, আগেই লিখেছি। টাকাটা এখনও পাই নি, হাতে এলেই আপনার বাঙ্কে পাঠিয়ে দেব। তার আগে, আপনাকে এই কথাটা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে চেয়েছিলাম যে, আমি আপনার ওসব দানশীল বড় মানুষদের ঘৃণার চক্ষে দেখি। তাঁরা দান করেন নামের জন্যে। মিথ্রা-মন্দির স্থাপনে আমার যে এই সামান্য কয়েক লাখ জ্লতীর চাঁদা, তাকে দান বলে' মনে ক'রবেন না, মস্তো স্বামী, এ সুধু জনৈক প্রবাসী হিন্দুসের স্ব-ধর্মের প্রতি যৎসামান্য কর্তব্য পালন বলে' মনে ক'রবেন, এই আমার অনুরোধ। আমি যে জাতিতে হিন্দুস্, আমার শরীরে যে হিন্দুদের আধ্যাত্মিক রক্ত প্রবাহিত, এর প্রমাণ যদি চান্ ত ভূরি ভূরি দিতে পারি, মস্তো স্বামী। একটা ঘটনার কথা বলি শুন্নন।

আমাদের এ-অঞ্চলটা আগে রুশীদের অধিকারে ছিল। সুতরাং ৎসারের পতন হবার সঙ্গে সঙ্গেই পিল্ পিল্ করে' এসে হাজির হ'লো দলে দলে বল্‌শেভিক্। বোধ হয় লক্ষ্য ক'রেছেন, এদিকে সুধু চাষা-কিষাণদের বাস, এমন কি আমার নায়েব, গোমস্তা, কেরাণী, সরকার ছাড়া এ-অঞ্চলে একটা বুর্জোয়া ভদ্রলোকের পর্যন্ত দেখা পাওয়া কঠিন। কেবল চাষা আর চাষা। সুতরাং বল্‌শেভিক্‌রা এসে আমার চাষা প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তুললে। হাজার বছর ধরে' আমাদের এই বংশ চাষাদের আপন সন্তান নির্বিশেষে লালন ও পালন করে' এসেছে। বল্‌শেভিক্‌দের প্ররোচনায় তারা হঠাৎ বিদ্রোহের লাল ঝাণ্ডা তুললে। সঙ্গে-সঙ্গে তারা আমার জায়গীরের নানান রকম ক্ষতি ক'রতে সুরু ক'রলে। শেষকালে একদিন তাদের খুন চেপে গেল। আমার বাড়ীর ওদিকটায় থাকতো আস্তাবল-ভরা ঘোড়া, খাঁটি আরবী আর আউস্ট্রালীয়। ঘোড়ার সখ আমার বরাবর। একদিন

* ২ জ্লতী = ১৲

চাষারা এসে আস্তাবলসুদ্ধ ঘোড়া জীবন্ত পুড়িয়ে মারলে, তারপর মশাল জ্বালিয়ে হাজারে হাজারে চাষা এলো আমাদের বাড়ীতে আগুন লাগাতে। আমার স্ত্রী তখন বেঁচে ছিলেন। চাষারা মশাল জ্বালিয়ে, ফটক ভেঙ্গে, বাড়ীর একেবারে দোরগোড়ায় এসে পড়েছে। তাদের থামাবার উপায় নেই। ভাবছি, কী করবো। এমন সময়ে হঠাৎ কী মনে হ'লো, ছুটে এসে বারান্দায় দাঁড়ালাম। মশালের আলোয় উঠোন, বাগান একেবারে লাল হয়ে উঠেছে। আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে সুধু চাষাদের সর্দারের দিকে শান্ত, সংযতভাবে তাকালাম। ব'লবো কী, মস্তো স্বামী, কয়েক সেকেণ্ড সে'ও আমার দিকে কট্মটিয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর যেন ঘুম থেকে আচম্কা জেগে ওঠার মত ফেল্ ফেল্ করে' চারিদিকে তাকাতে লাগলো। তারপর চাষাদের দিকে ফিরে ব'ললে, তাবারিশ্চ্, আমরা করছি কী? এ যে আমাদের বাপ, মা—পান্ হ্রাবিয়া আর পানী হ্রাবিনা! লজ্জায় মাথা হেঁট করে' আমার কাছে ক্ষমা চেয়ে তারা বাড়ী ফিরে গেল। সেই দিন স্পষ্ট উপলব্ধি ক'রলাম, আমার রক্তে কী এক অদ্ভুত শক্তি আছে, যা সচরাচর দেখা যায় না। তাছাড়া অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমি স্বপ্নে বা ধ্যানে এমন সহজভাবে আবিষ্কার করি যে, তা শুনলে আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন। সে-সব কথা পরে ব'লবো। ঐ শক্তিরই সাহায্যে একটা মোটা রকমের টাকা পাবার কথা আছে যে-টাকাটা আপনার বাঙ্কে জমা দেব, ব'লছিলাম। যাক্ সে কথা পরে ব'লবো।

এখন, আমি যে সত্যিকার হিন্দুস্, এর প্রমাণ একটু পরেই পাবেন। আগে থেকেই আপনাকে বলে' রাখি, আমি নিরামিষাশী। আগে অবশ্য খুবই মাংস খেতাম। এমন মাংস নেই যা আমি খাই নি! যত রকমের জন্তু-জানোয়ার আর পাখী। এমন কি দক্ষিণ আমেরিকায় বড় বড় ইঁদুরের মত একরকম জানোয়ার পাওয়া যায়, তা অবধি। কিন্তু এই

শেষ বয়সে, তেমনি তার প্রায়শ্চিত্ত ক'রতে হ'চ্ছে। আমার ভেতরকার আধ্যাত্মিক রক্ত সে-সব সহ্য ক'রবে কেন? কয়েক বছর আগে এমন গাউট আরম্ভ হ'লো যে ডাক্তাররা স্পষ্ট বলে' দিলে, আমার পক্ষে একটুক্‌রো মাংস আর এক ডেলা বিষ, দুই সমান। সেই থেকে আমার মাংস খাওয়া বন্ধ। বড় বড় কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে শেষকালে একজন নিরামিষ রান্নার পাচক পাওয়া গেল। লোকটার অদ্ভুত ক্ষমতা মশাই! সুধু আনাজ দিয়ে এমন জিনিষ রাঁধবে যে, তা খেয়ে কে না বলবে তা মাংসের তৈরী! লন্দন, পারী, বার্লিন্, ভারশোএ এমন নিরামিষ রেস্তোরাঁ নেই, যেখানে আমি খাই নি। কিন্তু সেখানে সুধু সেদ্ধ আর সেদ্ধ! ও আপনার আলু, মটর, গাজর, বরবটি, কোপি, বীট্, যা চান্, সব সেদ্ধ, আর তার ওপর খানিকটা শুক্‌নো পাঁউরুটির গুঁড়ো ভাজার সঙ্গে গলানো মাখন! আমার রাঁধুনী, মশাই, যা রাঁধে, তার তুলনা আমি কোথাও পাই নি, আজ পর্যন্ত। এইসূত্রে, আপনাকে বলি, মস্তো স্বামী, যদি রেস্তোরাঁর কথা তোলেন, ত লন্দনে হিন্দুস্‌দের যে রেস্তোরাঁ দেখে এসেছি, সেরকম রেস্তোরাঁ আমি কোথাও দেখি নি। ও আপনার কার্ল্‌টন্, রিট্‌স্, স্যাভয়, আমীর-ওমরাহদের আড্ডা বটে, কিন্তু খেয়ে সুখ ঐ যে কী বলে, নামটা মনে নেই, হিন্দুস্‌দের একটা রেস্তোরাঁয়। আর সে গার্‌সঁদেরই বা চেহারা কী! রঙ-বেরঙের তুর্‌বান্ মাথায়, যেন এক-একজন মাহারায়া!

সান্ধ্যভোজনের প্রথম পদ আসিয়া হাজির হইল, ক্ষুধা শানাইবার জন্য অর্ দ্যেভ্‌র্! বাট্‌লার সসম্ভ্রমে স্বামীজী ও হ্যাবিয়ার থালায় একটু একটু

করিয়া সাজাইয়া দিল, মেয়নেজের সসে মাখা মটরশুঁটি, গাজরের টুক্‌রা, বীট্‌ ও আলুর কুচী দিয়া তৈরী সালাদ্‌ রুস্‌। এক পাশে চাক্‌তি করিয়া কাটা তোমাতো ও পেঁয়াজ। তাহার এদিকে বম্বে ডাক্‌স্‌-এর মত করিয়া ভাজা বরবটি, ওদিকে আনাজের তৈরী সসেজ্‌, থালার মাঝখানে পোলাওয়ের পুর দেওয়া বড় বড় গোল গোল দুইটি তুর্কী লঙ্কা। বুভুক্ষু স্বামীজী অর্‌ দ্যেভ্‌র-এর সব উপকরণ-কয়টিই চোখের নিমিষে উদরসাৎ করিলেন। হ্রাবিয়া কহিতে লাগিলেন :

কেমন বলুন ত মস্তো স্বামীজী, রান্না ভালো কি না। যা খেলেন তাতে মাংসের সম্পর্ক পর্যন্ত নেই। ও খাঁটি নিরামিষ জিনিষ। আপনাদের দেশে যে-কোনো ব্রাহ্মণের পাতে দেওয়া যায়। মেয়নেজের সসে অবশ্য একটু মুর্গীর ডিমের কুসুম থাকেই, তা সে ধর্তব্যের মধ্যেই নয়। ওর বেশীর ভাগই অলিভের তেল। তারপর বরবটি ভাজা ঠিক বম্বে ডাক্‌স্‌-এর মত খেতে লাগলো কি না বলুন। হাতী ঘোড়া কিছুই নয়। স্রেফ্‌ আগুনের মত গরম লার্ড্‌-এ ফেলে ছাঁকা ভেজে নাও ব্যস্‌। আর ঐ সসেজের মত যা খেলেন, ওর সবটাই আনাজ, আর বার্লি। সুধু ওর ছালটুকু, নাম ক'রবো না, পাছে আপনার খেতে বিঘ্ন হয়, সেই জন্তুর পাকস্থলী, অবশ্য খুব পরিষ্কার করে' ধোয়া, একেবারে কেমিক্যালি ক্লীন্‌ড্‌।

স্বামীজী মিত্র-নাম স্মরণ করিয়া লিস্‌বনে ফিরিয়াই প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা মনে মনে স্থির করিয়া রাখিলেন। কোনো ছুতা করিয়া ওঠা যায় কিনা, ভাবিতেছেন, এমন সময়ে একটার পর একটা পদ আসিয়া বুভুক্ষু স্বামীজীর মনে বিকার ঘটাইয়া দিল। সমস্ত সঞ্চিত পাপের একত্র

প্রায়শ্চিত্তের সঙ্কল্প করিয়া তিনি পুনরায় আহারে মনোনিবেশ করিলেন ত্রাবিয়া পূর্বের মত পাকপ্রণালীর গল্প করিয়া চলিলেন।

জানি, আপনারা হিন্দুস্তানের মানুষ, ভারী শুদ্ধাচারে থাকেন, মাছ-মাংস খান্ না, প্রাণিবধ আপনাদের পবিত্রগ্রন্থাদির অনুশাসন-বিরুদ্ধ। আপনাদের দেশের ব্রামা, শিওয়া, বুদ্‌দা, যে-সব কথা বলে' গেছেন, অতবড় শিক্ষা জগৎ আজ পর্যন্ত কার কাছে পেয়েছে? আপনাদের মাহাত্মা গান্ধীও যে আজ এই নিষ্ঠুর বস্তুবাদী জগতের বুকে দাঁড়িয়ে তাঁর আহিম্‌সা প্রচার ক'রছেন, তার তুলনা কোথায়? নিরামিষ আহার সম্বন্ধে যদি আমার মত জিজ্ঞেস করেন ত আমাকে স্বীকার ক'রতেই হবে যে, অতবড় আদর্শ জগতে আজ পর্যন্ত হয় নি, হবে না। তবে সঙ্গে-সঙ্গে একথা না মেনে উপায় নেই যে, প্রাণিবধ বন্ধ হয়ে গেলে জগতের সব চেয়ে আদিম ও বোধ হয় সর্বশ্রেষ্ঠ যে শিল্প, পাক-শিল্প, তার সমূহ ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী। আপনাকে গোটাকয়েক উদাহরণ দিই।

ধরুন আমাদের এই পোলদেশের গৌরবের বস্তু, বিগস্। পোলদের পোলীয়তার বীজমন্ত্র ঐ একটি কথা বিগস্, এ আপনি নিশ্চয়ই জানবেন। বিগসের উৎপত্তি অবশ্য আমারই মত, লিতুয়ানিয়ায়। তার প্রমাণ পোলভাষায় অস্-অন্ত শব্দ নেই, এবং লিতুয়ানীয় বিশেষ্য-মাত্রই প্রায় অস্-অন্ত। তবে বিগস্ এখন মধ্যযুগের লিতুয়ানীয় সম্রাট য়াগেল্লোর মত সমগ্র পোলদেশে প্রভুত্ব ক'রছে। এই বিগসের কতরকম যে হেরফের তার ইয়ত্তা নেই। কয়েক রকম বাছা বাছা বিগসের বিবরণ শুনতে চান্ ত বলি। অবশ্য আশা করি, তাতে আপনার

আহারে বিঘ্ন ঘ'ট্‌বে না, আপনি শুদ্ধাচারী মানুষ! "বিগস্"-শব্দের পোলভাষায় আরও একটা অর্থ আছে তাও আপনাকে বলে' রাখি। "বিগস্" মানে ইংরেজীতে যাকে বলে "হচ্-পচ্", জগা-খিচুড়ী। যাই হোক্, এখন বিগসের বর্ণনা শুনুন, বলি।

এক কথায় ব'লতে গেলে, বিগসের উপকরণ মুখ্যত মিহি করে' কাটা জরানো টক্ বাঁধা কোপি, যাকে জার্মানী কায়দায় ইংরেজীতে বলা হয় সাউয়ারক্রাউট্, আর মাংস। আপনি জার্মানিতে সাউয়ারক্রাউট্ খেয়েছেন কিনা, জানি না। জার্মানী সাউয়ারক্রাউট্ ব'ললে যা বোঝায়, পোলদেশের কৃভাশনা কাপুস্তা বা জরানো টক্ বাঁধা কোপির সঙ্গে তার তুলনাই হয় না। আমাদের টক্ কোপি তৈরী করা সহজ নয়, মস্তো স্বামী! সুতোর মত মিহি করে' বাঁধা কোপি কাটতে হবে। ধরুন পনেরোটা কোপি। তার সঙ্গে সেরখানেক গাজর চাকতি করে' কেটে মেশাও, ছোট্ট ছোট্ট কুলের মত আপেল আধখানা করে' কেটে, ভেতরকার বিচি ফেলে দিয়ে তার সঙ্গে দাও, সের দুই আড়াই, তার পর নূন, মৌরী একটু একটু করে'। পিপে কিংবা বড় মাটির বা কাঠের গাম্‌লায় জরানো চ'লতে পারে। খানিকটা করে' কোপি ঢালতে হবে, তার পর আস্তে আস্তে একখানা চাকী বা হাত দিয়ে পিটে, থেঁৎলাতে হবে, যাতে সামান্য একটু রস বেরয়। তারপর আবার এক থাক কোপি। এমনি করে' সব কোপিটুকু যখন ধরে' গেল, তখন তার ওপর পিপের গোল ঢাক্‌না বা বারকোশ্-টারকোশ্ গোছের কাঠের তৈরী কিছু দিয়ে চাপা দিয়ে তার ওপর বেশ ভারী গোছের একখানা পাথর চাপিয়ে দাও। কিছুদিন পরেই কোপি ভেপ্‌সে উঠে তার ওপর ফেণা জমে উঠবে। ফেণাটুকু খুব সাবধানে ফেলে দিতে হবে, কারণ তাতে কোপির তেতো রসটুকু বেরিয়ে এসে জমা হয়েছে। তারপর হপ্তাখানেক পিপে বা গামলা আল্‌গা

রাখতে হবে, পরে ওপর থেকে লাঠি দিয়ে তলা পর্যন্ত গোটা কয়েক গর্ত করে' দিয়ে, কোপির ওপর চাপা-দেওয়া কাঠখানা এমন ভাবে রাখো যাতে, কোপির জল আস্তে আস্তে তার ওপর এসে জমা হয়। এর নাম আমাদের কৃভাশনা কাপুস্তা, জরানো টক্ কোপি। তার সঙ্গে মাংস। এখন এই বিগস্ কী ভাবে রাঁধতে হবে, শুনুন।

বড়দিন, ঈষ্টার বা অন্য কোনো উৎসব উপলক্ষে যে বিগস্ রাঁধা হয় তার পাকপ্রণালী হ'চ্ছে এই ঃ প্রথমে, বেশ বড় একটুক্রো চর্বিওয়ালা, কী বলে আপনার, ইয়ে, ছোট মাংস, জন্তুটার নাম না ক'রলেও বুঝতে পারছেন নিশ্চয়, বেঁটে, মোটা, তাকিয়ার মত, ইস্ক্রুপের মত পাকানো লেজ, শুঁড়হীন হাতীর মত মুখ। মাংসটা কিন্তু বেশ চর্বিওয়ালা হওয়া চাই। অনেকক্ষণ ধরে' তাকে সেদ্ধ ক'রতে হবে। তারপর তার চর্বি-টল্‌টলে জলটুকু আলাদা করে' রাখ। গোটা কয়েক পেঁয়াজ চাক্‌লা করে' কেটে চর্বিতে একটু নেড়েচেড়ে সামান্য ভেজে নাও। তারপর খানিকটা টক্ কোপি আর ঐ পেঁয়াজ, রাঁধবার পাত্রে ফেলে আগুনে চাপিয়ে আস্তে আস্তে মাংসের জলটুকু তাতে ঢেলে দাও। আগুন যেন জোরালো না হয়। মাংসের জলে কোপি গুমে গুমে সেদ্ধ হ'তে থাক। ইতিমধ্যে যত রকমের মাংস পাওয়া যায় হাতের কাছে, আভেনে পূরে দাও রোষ্ট্ ক'রতে। ও তোমার হাঁস, মুর্গী, পেরু, খরা, গিনী-ফাউল, উৎসবের সময় এসব থাকেই। অবশ্য, কী বলে, আপনার, বড় মাংসও খানিকটা চাই। মাংস রোষ্ট করা হয়ে গেলে, খানিকটা করে' কেটে নাও। তারপর যখন তা বেশ জুড়িয়ে শুক্‌নো হয়ে যাবে, তখন সব রকমের রোষ্ট্ মাংস ছোট ছোট চৌকো করে' কেটে হাতের কাছে মজুত রাখ। তার সঙ্গে বেশ খানিকটা স্মোক্‌ড্ হ্যামও চাই, আর সসেজ, ঐ রকম চৌকো করে' কাটা। এইবার দেখতে হবে, কোপিসেদ্ধ কতদূর। কোপির জল মরে' যখন বেশ একটু

তেলা-তেলা ভাব হয়ে আসবে, তখন মাংসের টুক্‌রোগুলো ফেলে, বেশ নেড়ে চেড়ে একত্র মিশিয়ে, ঢাকা দিয়ে দাও। খানিকক্ষণ পরে যখন বেশ মাখো-মাখো হয়ে আসবে, তখন নামিয়ে নাও। এর নাম 'বিগস্‌। অবশ্য এখানেও এর শেষ নয়। যেদিন রাঁধা হ'লো, সেদিনই তাকে পাতে দেওয়া চ'লবে না। বিগস্‌ রাঁধা হ'লো বটে, তবে এখন তাকে বাসি ক'রতে হবে। দিন দুই ধরে' এইসব উপকরণগুলি একত্র সহবাসে পরস্পরের সঙ্গে মিশতে সুরু ক'রবে। দু'দিন পরে আবার তাকে গরম করো, এবং গরম-গরম পাতে দাও। বিগস্‌ সাত, আট দশ দিন পর্যন্ত খাওয়া চলে। যত দিন যাবে, এবং যত বার গরম করা হবে, ততই এর ভেতরকার মিষ্টিক্‌, রহস্যময় রসটুকু আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসবে। বিগস্‌ মানে জগা-খিচুড়ী বটে, কিন্তু মস্তো স্বামীজী, সঙ্গীতে ঐক্যতানের যা আদর্শ পাক-শিল্পে বিগস্‌ একেবারে তাই। হারমনিয়া, সমন্বয়।

বিগসের বর্ণনায় স্বামীজী আপন মৃগচর্মের ব্যাগস্থ সমুদ্রপীড়া-প্রতিরোধক কী একটা বড়ির কথা ভাবিতে ভাবিতে থালার উপর অর্দ্ধভুক্ত আহার্য লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছেন, এমন সময়ে হ্রাবিয়া পাত্রস্থ ভোজ্যটির প্রতি নির্দেশ করিয়া কহিলেন—

খাবারটার চেহারা যেমন, কিন্তু আসলে তা মোটেই নয়! ওর ভেতর আছে সুধু চীস্‌, মটরশুঁটি বাটা, আরো কী কী, আর ডিম। ও একেবারে নিরামিষ, মস্তো স্বামীজী, আপনি অনায়াসে খেতে পারেন। তবে লোকটা যে কী যাদু জানে মশাই! খেয়েই অবশ্য আপনার মনে হয়েছে, ওটা মীন্‌। স্বাদ মীনের বটে, তবে ওর উপকরণ নিরামিষ।

ঐটেই লোকটার কারসাজি! ওটি আমার প্রিয় খাদ্য। জানতাম আপনি ভীল্ খাবেন না, অবশ্য আমিও খাই না, তাই ঐ জিনিষটি আজ বিশেষ করে' রাঁধতে ব'লেছিলাম।

মিত্রোপাসক, সদ্‌ব্রাহ্মণবংশসম্ভূত স্বামীজী ভাবিতে লাগিলেন, আজিকার সন্ধ্যায় যে-সমস্ত জিনিষ উদরস্থ ও কর্ণবিবরস্থ করিলেন, তাহার প্রায়শ্চিত্ত বোতলভরা সমস্ত সিন্ধু-নদের জলে, এমন কি সমস্ত সিন্ধু-নদটাকে গ্রাস করিয়া ফেলিলেও, সম্ভব কিনা সন্দেহ। ভাবিয়া অন্য একরকম বিগসের বর্ণনা সুরু করিলেন।

এ ত গেল সাধারণ বিগসের কথা, যা আপনি ভারশৌএর বা ভীল্‌নোর বা অন্য কোনো সহরের যে-কোনো রেস্তোরাঁয় আক্‌ছার পাবেন। এখন সত্যিকার বিগসের কথা বলি। তার নাম "শিকারীদের বিগস্।" বিগস্ জিনিষটা আসলে শিকারীদের একচেটে ছিল। শিকার ক'রতে গিয়ে তারা বনে-জঙ্গলে খাবে কী? চাষাভূষোদের কাছে পেত টক্ কোপি, বাদবাকী উপকরণ তাদের সঙ্গেই থাকতো। শিকারের ঘাঁটিতে তা রান্না করা হ'তো। পাক-প্রণালী প্রায় একই, তবে মাংস যা পাওয়া যায় তাই। সাধারণতঃ হরিণ, খরা, বুনো হাঁস, যতরকমের পাখী, তাছাড়া যদি শিকার মেলে ত বুনো ছোট মাংস। মশাই, ঐ জিনিষটি বাদ দিয়ে রাঁধা বিগস্ বিগস্‌ই নয়। তার মাংস এমন টক্‌টকে গাঢ় লাল, যে তাকে দূর থেকে একেবারে কালো দেখায়। আর তার ঐ বুনো-বুনো, সোঁদা-সোঁদা গন্ধটি, অভ্যেস না থাকলে খেতে বিঘ্ন হয় বটে, কিন্তু দু'একবার খেলে ও-ছাড়া আর কিছু মুখে রুচবে না। আর সে কী নরম, যেন মাখন! এই মুখে দিয়েছ কি এই

নেই! শিকারীদের বিগসে আর একটি জিনিষ অবশ্য চাই-ই চাই, সেটি হ'চ্ছে পুরো একটি বোতল উৎকৃষ্ট মাদেরা। মস্তো স্বামীজী, সে বিগস্ নয়, অমৃত! স্বয়ং আগ্নি, মিথ্রা, বারুণার খাদ্য!

স্বামীজী বহুকষ্টে আত্মসম্বরণ করিতে চেষ্টা করিলেন বটে, কিন্তু অশনকক্ষ হইতে কোন্ এক অজ্ঞাত, অপরিচিত কলঘরের পথে হ্রাবিয়ার দামী ইরাণী গালিচাখানিকে লিস্‌বনের পথে বিস্কে উপসাগররূপে ব্যবহার করিলেন।

পরের দিন তিনি তাঁহার মৃগচর্ম্মের ব্যাগ ও হস্তিদন্তের পরিব্রাজকের যষ্টি হাতে লইয়া হ্রাবিয়ার কাছে বিদায় লইবার সময় শুনিতে পাইলেন, পবিত্র মহাপীঠস্থান মিথ্রাপুরে মিথ্রামন্দিরের স্থাপনাকল্পে কয়েকলাখ জ্‌লতীর চেকখানি হ্রাবিয়া কিছুদিনের মধ্যেই তাঁহার নামে তাঁহার বাঙ্কে পাঠাইয়া দিবেন। তবে একটু দেরী হইতে পারে, কারণ তিনি তাঁহার অলৌকিক, আধ্যাত্মিক শক্তির সাহায্যে এক বিখ্যাত চিকিৎসককে কী এক দুরারোগ্য রোগের বীজাণু ও তাহার প্রতীকারের সন্ধান বাতাইয়া দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। উক্ত চিকিৎসক নোবেল পুরস্কার পাওয়া মাত্রই তাহার অর্দ্ধেক অর্থ হ্রাবিয়াকে দিবেন, এইরূপ চুক্তি হইয়াছে। সুতরাং যে মিথ্রাদেবের আশীর্বাদে হ্রাবিয়া এই অলৌকিক শক্তি লাভ করিয়াছেন, এই সামান্য কয়েকলাখ জ্‌লতী যে তিনি তাঁহারই সেবায় লাগাইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য কী?

অনবদ্য শিষ্টতা সহকারে হ্রাবিয়া পুনরায় তাঁহার অশ্বিনীকুমারদ্বয়-বিনিন্দিত শাদা ঘোড়া ও আবলুশ-কালো জুড়ীতে করিয়া, ঘুঙুরের শব্দে কিষাণ-কিষাণীদের সন্ত্রস্ত করিয়া, স্বামীজীকে ষ্টেশনে পৌঁছাইয়া দিয়া

আসিলেন, এবং সুযোগ পাইলে আবার তাঁহার জায়গীরে আসিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিলেন। তাঁহার মিষ্ট স্বভাব ও শিষ্টাচারের অজস্র অভিব্যক্তির মাঝে লিস্‌বন্ হইতে যাওয়া-আসার ট্রেন্-ভাড়া ও রাহা-খরচের কথাটা উল্লেখ করা নিতান্ত অশোভন হইবে ভাবিয়া স্বামীজী তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠিয়া পড়িলেন। গাড়ী ছাড়িবার সময়ে হাবিয়া স্বামীজীকে মনে করাইয়া দিতে ভুলিলেন না, যেন তিনি এই প্রবাসী হিন্দুস্টির কথা বিস্মৃত না হন্।

কলিকাতা,

২৪শে বৈশাখ, ১৩৪৮

উচ্চারণ-নির্দেশ

পোলভাষার উচ্চারণ স্থূলতঃ বাংলা ভাষার অনুরূপ। যে শব্দ কয়টি এই গ্রন্থে বাংলা অক্ষরে সম্যক্‌রূপে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নাই তাহা এই ঃ

জ=z.

ঝ=j (ফরাসী)।

ভ=v.

উদাহরণ ঃ   zলতী, কাতাj ীনা, v ীতল্‌দ্‌।

সূচীপত্র